বনে যদি ফুটল কুসুম

বনে যদি ফুটল কুসুম

বনে যদি ফুটল কুসুম

প্রতিভা বসু

কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ মাঘী পূর্ণিমা ১৭ই মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থম্

২২।১, কর্নওআলিস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ

রিপ্রোডাক্‌সন সিণ্ডিকেট

মুদ্রক

শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মূল্য ৪'৫০ ন. প.

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পাড়ায় দারুকেশ্বরবাবুকে সবাই চেনে। অনেকদিন আছেন তিনি এ পাড়ায়। সেই যুদ্ধের আগে থেকে। এ পাড়া তখন এরকম ছিলো না, তখনো এসব রাস্তায় আলো আসেনি, মাঠ ঘাট খানাখন্দ মন্দির মসজিদ বিলুপ্ত ক'রে পাকা রাস্তা গড়ে ওঠেনি, কাঁচা নর্দমা আণ্ডারড্রেণের তকমা আঁটেনি। তাঁর বাড়ির পাশে তখন মস্ত আম জাম কাঁঠালের বাগান ছিলো, উল্টোদিকে রাশি রাশি কাশফুল ফুটে সাদা হ'য়ে থাকতো। সেই সময়ে একটা লাল রংয়ের গরু পুষেছিলেন তিনি, সেই গরু সেই সব বনে জঙ্গলে চরে বেড়াত ঘাস খাবার জন্য। সকাল বেলা দারুকেশ্বর কাজে যাবার আগে ভালো ভালো ঘাসজমি দেখে তাকে খুঁটি গেড়ে রেখে যেতেন; বিকেলবেলা গরুটা হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়লে তাঁর স্ত্রী এদিক ওদিক তাকিয়ে, মাথায় ঘোমটা টেনে নিজে এসে নিয়ে যেতেন। অনেক দুধ দিত গরুটা, সেই দুধ দারুকেশ্বর পাড়ার সব মিলিয়ে পাঁচ সাতখানা বাড়ির মধ্যেই বিক্রী করতেন। দুধে তিনি জল মেশাতেন না, তাই দামটা একটু বেশী নিতেন। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিতেন বাড়িসংলগ্ন গাব গাছের গায়ে। আশে পাশে বাজার ছিলো না তখন, শোনা যাচ্ছিলো লেক-মার্কেটের কাছে কোথায় একটা বসবে। সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন দারুকেশ্বর-বাবু ল্যান্‌সডাউন মার্কেটে গিয়ে তরি-তরকারী নিয়ে আসতেন

তাইতেই চালিয়ে নিতে হ'তো সাতদিন। বেশী লাগলে, কি খরচ ক'রে ফেললে সেই অপচয় তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। গড়ে হাটার মোড়ের দু' পাশে বড়ো বড়ো মাঠ ছিলো, আর মজা ডোবার ভিড় ছিলো। সেই সব ডোবাতে কচুরিপানা আর কলমীলতার বন ছিলো। তারে তীরে লকলকে সতেজ হিঞ্চে-শাক জন্মাতো, কচুশাক জন্মাতো। ফেরিউলিরা তুলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রী করতো। সন্ধ্যা হ'লে লক্ষ লক্ষ মশা উড়ে আসতো সেখান থেকে, ছড়িয়ে পড়তো ঘরে ঘরে। মেয়েরা সাত তাড়াতাড়ি বেলা পড়তে না পড়তেই তাদের ভয়ে জানালা বন্ধ ক'রে দিত, গাঢ় ক'রে ধুনোর ধোঁয়া দিয়ে অন্ধকাব ক'রে ফেলতো। তবুও টিঁকতে পারতো না তাদের কামড়ে। ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি জ্বলতো, বুনো ফুলের গন্ধ উঠতো, বর্ষাকালে জল জমতো বাস্তায়, ব্যাং ডাকতো কড়্ কড়্ ক'রে।

দারুকেশ্বরবাবুর ছোট্টো তিন কোঠার এক একতলা বাড়ির খোলা বারান্দা থেকে মাঠ পেরিযে সোজা লেক দেখা যেতো, সেই লেকের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় চুপচাপ বসে থাকতেন তাঁর স্ত্রী, অন্যমনস্ক হ'যে যেতেন। ছেলেমেযেরা ছুটোপুটি করতো ঘবের মধ্যে, অসুস্থ শরীর নিয়ে সেই সময়ে তাঁর ধীরে ধীরে হেঁটে সেই টলটলে জলের তলায় গিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করতো।

অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের রোগা ছোট্ট এইটুকু একটা মানুষ। কাটা কাটা নাক চোখ ঠোঁট, কিন্তু বং একেবারে অমাবস্যার অন্ধকারের মতো কালো। কিন্তু অত কালোর মধ্যেও মধুরতা ছিলো, লাবণ্য ছিলো। দারুকেশ্বরবাবুর চেহারা ছিলো একেবারে

সম্পূর্ণ স্ত্রীর বিপরীত। তাঁর রং যেমন টক্‌টকে ফর্সা মুখশ্রী তেমনি থ্যাবড়া। নাক ভোঁতা, চোখ ছোটো, ঠোঁট পুরু, গড়ন বেঁটে। কেশবিরল মাথাটি দেহের তুলনায় ছোটো। শুধু এই আকৃতিগত বৈষম্যই নয়, দু'জনের চরিত্রেও কোনো মিল ছিলো না। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী যেমনি শান্ত দারুকেশ্বরবাবু তেমনি কোপনস্বভাব, স্ত্রী যেমনি মিষ্টভাষী তিনি তেমনি কটু-বাক্যে পটু। দারুকেশ্বরবাবুর স্ত্রী লোকজন ভালোবাসতেন, কেউ এলে আতিথেয়তার ত্রুটি করতেন না, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে চাইতেন। দারুকেশ্বরবাবুর আবার সে সবে ভীষণ অনীহা। কেউ এসে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবে, আর তিনি তাঁর শরীরের রক্ত-জল-করা অর্থ সামর্থ্য দিয়ে পাদ্যার্ঘ্য সাজাবেন এমন বাতুল কল্পনা মনেও ঠাঁই দিতেন না। সেই ভয়ে কারো সঙ্গে আলাপ সালাপই করতেন না তিনি। বলা যায় না, প্রশ্রয় পেয়ে কে কোথায় এসে হাজির হয়। আত্মীয় কুটুম্ব গ্রাম সুবাদে পরিচিত—এসব তো সভয়েই পরিহার করতেন, এমন কি প্রতিবেশীদের মধ্যেও যদি কেউ সহাস্যে তাকাতো কি কুশল প্রশ্ন করতো, তৎক্ষণাৎ রাগতভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে স্পষ্ট বুঝতে দিতেন এসব গায়ে-পড়া আলাপ তিনি পছন্দ করেন না।

প্রতিবেশী বলতে পাড়ায় কেই বা ছিলো তখন। সস্তায় জমি কিনে অনেক বুদ্ধিমানেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার পরিচয় দিয়েছিলো বটে, কিন্তু বাড়ি বানিয়েছিলো খুব কম লোক। বড়ো রাস্তা রাসবিহারী এভিনিউর দু'পাশেই প্রায় ফাঁকা জঙ্গল, ভিতরে ভিতরে তো আরো কম। একটা বাড়ি থেকে আর একটা

বাড়ির মাঝখানে অনেকখানি জায়গা খালি পড়ে থাকতো, দূরে দূরে ছড়ানো ছিটোনো এ বাড়ির উঠোন থেকে সে বাড়ির ছাদ দেখা যেতো কি যেতো না। মোড়ের মাথায় বাঁধানো বটতলা ছিলো একটা। বটগাছটার সঙ্গে একটা পাকুড় গাছ জড়িয়ে উঠেছিলো। লোকেরা বলতো বট পাকুড়ে বিয়ে হ'য়েছে। আর বিয়েটা অমনিই হয়নি, নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছে। আর দিয়েছে বলেই জায়গাটা এমন সুন্দর ক'রে বাঁধানো হ'য়েছে। কিন্তু কে দিয়েছে সে কথা জানতেও লোকেদের কৌতূহল হ'তো বৈ কি। সেই কৌতূহল নিবারণও হ'তো। একটু দূরেই গাঁয়ের মস্ত জমিদার জগদ্দল বাঁড়ুজ্যের পোড়োবাড়ি পড়ে আছে অতীতের সাক্ষী নিয়ে। সে বাড়ির ভেঙে পড়া ছাদের খিলানে খিলানে কবুতরের বাসা, নাটমঞ্চে গোখরো কেউটেদের পাকা আস্তানা, বাগানের জঙ্গলে দেউড়ির কাছে রঘুডাকাতের কালীমন্দির। সেই মন্দিরে পুজো দিতো স্থানীয় লোকেরা, ভক্তি করতো, ভয় করতো, মানত করতো। গল্পও তারাই বানাতো। নতুন উপনিবেশের নতুন অধিবাসীদের কাছে সে সব বলে খুব বাহাদুরী নিতো। যার যেমন খুশি বানিয়ে বলবার বাধা ছিলো না কোনো। গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে। আর তার মধ্যে যদি একটু সত্যের গন্ধ ভ'রে দেওয়া যায়, কে না রোমাঞ্চিত হয়।

কিন্তু দারুকেশ্বর হতেন না। এসব ভাবের বিকার থেকে তিনি মুক্ত, আলাদা, স্বতন্ত্র। তাই তিনি কখনো আর সকলের মতো বটতলার আসরে গিয়ে বসতেন না, দাঁড়াতেন না, তাকাতেন না, শুনতেন না। সকালে কাজে যেতেন মুখ বুজে কোনোদিকে না তাকিয়ে, বিকেলে ফিরতেন ঠিক সেই ভঙ্গিতে।

সেই কাঁকুলিয়া পাড়ার নির্জনে দুপুরের রোদ যখন থর থর ক'রে কাঁপতো, ফড়িং প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াতো, সকালের মিঠেগন্ধ ভাণ্ডিফুলগুলো নেতিয়ে যেতো আগুনের হল্‌কার মতো গরমে, সেই সময়ে একটি পুরুষও থাকতো না পাড়ায়। তখন খাওয়া দাওয়া কাজকর্ম সেরে ঘুমুতে না গিয়ে এ বাড়ির মেয়েরা ওবাড়ি বেড়াতে যেতো আর ওবাড়ির মেয়েরা সে বাড়ি-। ছেলেমেয়েরা কেউ ঘুমুতো, কেউ মায়ের সঙ্গ ধরতো, কেউ কেউ মাকে এড়িয়ে লুকিয়ে পালিয়ে চলে যেতো মস্ত মাঠে ফড়িং ধরতে। আসলে বাড়ির গিন্নীদের একা একা ঘরে থাকতে ভয় করতো তখন, একসঙ্গে হ'য়েই চোখ বড়ো করে বলতো, 'বাব্বা, কী বিষম জায়গাতেই বাড়ি ভাই, এখন ডাকাত এসে কেটে-কুটে ঝোল বানিয়ে খেয়ে গেলেও রক্ষা করবার কেউ নেই।'

কথাটা মিথ্যে ছিলো না। বড়ো রাস্তা থেকে অনেকটা দক্ষিণের এই পাড়াটা তখন সত্যিই ভয়াবহ ছিলো। যারা নিজেরা বাড়ি করেছিলো তারাই বলতে গেলে প্রাণের দায়ে থাকতো সেখানে, ভাড়ার বাড়ি অতি অল্প। সে সব বাড়ি প্রায়ই খালি পড়ে থাকতো আর ভাড়া হ'লেও সস্তা হ'তো খুব। বলাই বাহুল্য সেই সস্তার জন্যই এখানে এসেছিলেন দারুকেশ্বর। নির্জনতার জন্য তাঁর মনে এতোটুকুও শঙ্কা ছিলো না। শিশু-সন্তানদের দিয়ে স্ত্রীকে একা রেখে যখন কাজে যেতেন, তখন তিনি চোর ডাকাতের কথা ভাবতেন না, ভাবতেন গায়ে-পড়া আলাপী প্রতিবেশীদের কথা। ভয় পেতেন তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এসে যদি ভাব জমায়। সেই জন্য যাবার সময় তিনি বারে বারে সাবধান ক'রে দিতেন, যেন এক পা বাড়ি থেকে না

বেরোন তাঁর স্ত্রী, এবং ছেলেমেয়েদেরও বেরুতে না দেন। তবুও সংশয় কাটতো না। কতোদিন হঠাৎ হঠাৎ এসে প'ড়ে দেখে যেতেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে চুপ চাপ ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে বসে শুয়ে থাকতে দেখে খুশি হ'তেন, নিশ্চিন্ত হ'তেন।

শুধু এই একটি বাড়ি, একটি পরিবারই এই রকম বিচ্ছিন্ন ছিলো পাড়ার মধ্যে। তা নৈলে আর সকলের সঙ্গেই সকলের বন্ধুতা ছিলো, নিবিড়তা ছিলো, আত্মীয়তা-বোধ ছিলো। সকলেই সকলের বিপদে আপদে এসে বুক পেতে দাঁড়াতো, উচ্চারণ ক'রে না বললেও তার প্রতিশ্রুতি ছিলো।

অবিশ্যি পাড়া বেড়াবার মতো অবসরও ছিলো না দারুকেশ্বর বাবুর স্ত্রীর। বছর বছর সন্তান ধারণ এবং পালনেই তো তার আদ্ধেক দম ফুরিয়ে গিয়েছিলো, তার উপরে সংসারের সমস্ত কাজ। তারও উপরে গরুর পরিচর্যা। বাড়ির পাশে অন্যের জমিতে বাখারির বেড়া ঘিরিয়ে ছোট্ট একটু সবজির খেতও করেছিলেন দারুকেশ্বর। দু' বেলা তাতে জল টেনে টেনে দেওয়ার পরিশ্রমও দারুকেশ্বরের স্ত্রীর কাছে কম কষ্টকর মনে হ'তো না। বুকের ওঠাপড়া তার এতোখানি বেড়ে যেতো।

তা আর কী হবে। ঘর-সংসার করতে গেলে খাটতে হয় একটু। এতো অল্পেই যদি ক্লান্ত হবে, ভেঙে পড়বে তা হ'লে তার জীবনের অর্থ কী। রোজগারের জন্য দারুকেশ্বরই কি সোজা খাটছেন? টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর করতে করতে তো দড়ি ছিঁড়ে ফেলছেন পায়ের, এক ফোঁটা লাভের ইঙ্গিত পেলে আরো কোথায় কোথায় যে চলে যান হিসেব থাকে না কোনো। যেন একটা চর্কি। রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম কিছুই

কি ভ্রূক্ষেপ করতে পারছেন এই কর্মের প্রহারে? সেটা কি দেখছে না তাঁর স্ত্রী!

সংসারে উপার্জনের জন্যও যেমন খাটতে হয় তাঁকে, সেই উপার্জন রক্ষা করার জন্যও তার চেয়ে কম খাটেন না। এক চক্ষুকে তিনি দশ চক্ষু ক'রে রেখেছেন। কোথায় এক ফোঁটা বেশী গলে যাচ্ছে আঙুলের ফাঁক বেয়ে, অমনি চেপে ধরেছেন তার টুঁটি, পরিশ্রমের অর্থ কি বিকিয়ে দেবার জন্য। আর পাঁচটা বাড়ির মতো বৌকে টাটে বসিয়ে কাজের জন্য ঝি রেখে দেবেন তেমন পুরুষত্বহীন পুরুষ তিনি নন। স্ত্রীলোকেরা তবে করবে কী? রান্না করা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ছেলেপুলে মানুষ করা, গরুর সেবা এগুলো তো তাদের অবশ্য কর্তব্য। পারি না বললে শুনবেন কেন?

এই তো দুধ বিক্রী ক'রে সুন্দর লাভ হচ্ছে। একটা লোক রেখে দিলে থাকবে কী? আর অনর্থক আর একটা লোকের জন্য খরচই বা কেন কববেন? পয়সা কি সস্তা? পয়সা কি তার জন্য গঙ্গার জলে ভেসে এসেছে? না কি গাছের ফল, যে ঝাঁকি দিলেই পড়বে?

২

এ স্বভাব দারুকেশ্বরের পৈতৃক। আশৈশব তিনি এই রকম অমিশুক, অপ্রসন্ন, অনুদার, আত্মীয়বিমুখ এবং বন্ধুতায় শিথিল। তাঁর বাবা কেদারেশ্বর ঠিক এইরকম ছিলেন। তিনিও তাঁর কোনো আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন না, কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না, কারোকে ভালোবাসতেন

না। তাই নিয়ে অনবরত ঝগ্‌ড়া হ'তো স্ত্রীর সঙ্গে, অনবরত অশান্তি চল্‌তো।

প্রকৃতপক্ষে এই পরিবারে এই অশান্তি শুধু এক পুরুষের নয়, কতোদিন ধ'রে এই চলে এসেছে। কেদারেশ্বরের বাবা যজ্ঞেশ্বরও ঠিক এইরকম ছিলেন। হয়তো বা তাঁর বাবাও। বিশুদ্ধ রক্তের মধ্যে কবে যে কোন মাতা অথবা পিতা এই এক ফোঁটা বিষ ঢেলে গেছেন কে জানে। সে বিষ আর শোধন হচ্ছে না। পরিবারের প্রত্যেকটি পুরুষের এই চরিত্র। এই চরিত্র নিয়েই জন্মায় তারা। বিভিন্ন বংশের মায়েরা এসেও এই রক্তকে পরিস্রুত করতে পারে না।

দারুকেশ্বর কেদারেশ্বরের একমাত্র ছেলে। কিন্তু মেয়ে আছে ত্‌'টি। পর পর ত্‌'টি মেয়েকে প্রসব করবার অপরাধে মেয়েদের মাকে কেদারেশ্বব রীতিমতো নির্যাতন করতেন। একদিন না একদিন তারা পরের ঘরে চলে যাবেই আর পরের ঘরে গিয়ে আলাদা স্বার্থে আলাদা পরিবারে নিশ্চয়ই তারাও পর হ'য়ে যাবে, সুতরাং সেই পরেদের দঙ্গল বেঁধে সংসারে আনবার কী প্রয়োজন ছিলো এই কৈফিয়ৎটা স্ত্রীর কাছে অনেক-বার তলব করেছেন কেদারেশ্বর। আর তারপর পরম পণ্ডিতের মতো দার্শনিক দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়েছেন তিনি, তাকিয়ে তাকিয়ে হা হুতাশ করেছেন। খারাপ ব্যবহার করেছেন তাদের সঙ্গে, পিতা হ'য়েও পিতার এতোটুকু স্নেহ অনুভব করেন নি হৃদয়ের মধ্যে।

এই পরিবারের এটাও একটা রীতি, ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী হয়। কেদারেশ্বর নিজেও তাঁর বাবার একমাত্র পুত্র ছিলেন, কিন্তু বোন ছিলো সাতটি। তবু রক্ষে পিতার

পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁরও সাতটি হয় নি। সেটুকুই ভাগ্যের জোর।

অর্থ বিত্ত নিতান্ত মন্দ ছিলো না কেদারেশ্বরের। জমি জমা তো ছিলোই, তার উপরে একটি মস্ত পুকুর ছিলো, সেই পুকুর-ভরা মাছ ছিলো। সেখান থেকে একটি মাছও তিনি নিজে খেয়ে বা পরকে বিলিয়ে অপচয় করেন নি, সব বিক্রী করেছেন নিকিরীদের কাছে। নিজেরা নিতান্ত গরীবের মতো থেকেছেন। অথচ পরিবার ছোট, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যথেষ্ট সচ্ছল ভাবে থাকাই স্বাভাবিক ছিলো। লোকেরা বলেছে কেদারেশ্বর মাটির তলায় ঘড়া ঘড়া টাকা পুঁতে রেখেছে, মরে যখ দেবে সেই জমানো টাকার উপরে।

অনেক দিন পর্যন্ত দারুকেশ্বর কেদারেশ্বরের একমাত্র সন্তান হয়েই বিরাজ করছিলেন সংসারে। কেদারেশ্বর ভেবেছিলেন আর বুঝি কোনো মুখ এসে গ্রাসাচ্ছাদনের ভাগ বসাবে না, ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। ছেলের সাত বছর পরে আবার তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হ'লেন। তারপর তাঁর আশার মুখে ছাই দিয়ে ছ' বছরে পর পর দুই দুই কন্যা প্রসব ক'রে ক্ষান্ত দিলেন। কপাল চাপড়ালেন কেদারেশ্বর।

প্রথম মেয়েটির বয়স যখন এগারো হ'লো, আঠারোয় পা দেওয়া, এক মুখ দাড়িগোঁফ গজানো, একবুক লোমজমানো, দারুকেশ্বর মোটা গলায় বললেন, 'বড়ো-খুকির সম্বন্ধ ছাখো বাবা।'

একটু অবাক হ'য়ে কেদারেশ্বর বললেন, 'বড় খুকির! এখুনি।' দারুকেশ্বর বললেন, 'এগারো বছর কি কম? আমার পিসিদের তো সব ঐ বয়সেই বিয়ে হ'য়েছে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কিন্তু কোরো না। ও সব যতো তাড়াতাড়ি পারো বিদায় দাও। সেই তো দিতেই হবে, তবু এখন দিলে কয়েক বছরের খাওয়া-পরার খরচটা বেঁচে যাবে।'

তাই তো। কেদারেশ্বর তো এতোদূর পর্যন্ত ভেবে দেখেন নি। ছেলের বুদ্ধি দেখে থ' হ'য়ে গেলেন। কথাটা তো দারুকেশ্বর খুব যুক্তিসঙ্গত বলেছে। এগারো বছরের মেয়েকে তেরো বছর বয়স অব্দি টানা মানেই আরো দু' বছর খরচ বাড়ানো। দু' বছরে বারো দুগুণে চব্বিশ মাসের খরচ! ওরে বাবা! সে কি কম!

'ঠিক। ঠিক বলেছিস।' ছেলেব পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি। বিচলিত না হ'য়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'ছোটো খুকির বিয়েও ঐ সঙ্গেই দিয়ে দাও।'

'ছোট খুকি।'

'তারও তো নয় পুবলো। কম কী? এক সঙ্গে হ'লে অনেক কম খরচায় হবে। বলবো না বলবো না ক'রেও দু'চার ঘর আত্মীয়কে তো নিমন্ত্রণ করতেই হবে, এক গোষ্ঠি বোন আছে তোমার, নিন্দের ভয়ে তাঁদেরও তো চিঠি পাঠাতে হবে। আর বলা যায় না, অমনিই হয়তো গন্ধে গন্ধে হাজির হবেন এসে। সে আর দু' দু'বার কেন একবারেই ল্যাঠা চুকুক।'

সব শুনে মা বললেন, 'তা হ'লে আঁতুড়ে থাকতেই গলা টিপে মেরে ফেললি না কেন? সব আপদ একেবারেই চুকে যেতো।'

মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'বিয়ে দেওয়া আর গলা টেপা বুঝি এক?'

কেদারেশ্বর বললেন, 'তোমার মার কথা যেতে দাও দারুক, তার তো আর রোজগার করতে হয় না। দিব্যি পরের পয়সায় খায় আর আঠেরো মাসে বছর যায়। যততো সব—'

মোটকথা ছেলের এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও চমৎকার মনে ধরলো কেদারেশ্বরের। মনে মনে খুব গৌরববোধ করলেন তিনি ছেলেকে নিয়ে। তিনি মরে গেলে যে তাঁর টাকাকড়ি পাঁচ ভুতে লুটে খাবে না এ কথা ভেবে নিরুদ্বেগ হ'লেন।

স্ত্রীকে তিনি একটুও বিশ্বাস করেন না। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। মেয়েমানুষের যুক্তি শুনতে গেলেই হ'য়েছে আব কি। তবু দারুকেশ্বরের মার সব কথাতেই নাক গলানো স্বভাব। সব কথাতেই আপত্তি করা স্বভাব। কোথায় এসব বুদ্ধি নিজে দেবে, তা তো নয়ই, উপরন্তু ঐ একফোঁটা ছেলের উপরে চোপা। যা হোক, তবু তো ঐ ছেলেরই গর্ভধারিণী সে, সুতরাং তাকে তিনি ক্ষমা করলেন সেদিন। কোথায একটু করুণাও বোধ করলেন।

আব তারপরে চললো সম্বন্ধ দেখার পালা। ঘটক তো বাঁধাই আছে। খবর পেয়েই সে ছুটে এলো, এক মাসের তিরিশ দিনে তিরিশটা পাত্রের খোঁজ দিল সে। পাত্রদের গুণবিচারের পালা নেই এখানে, বিচার্য বিষয় হচ্ছে টাকা। যে ছেলে যতো কমে পাওয়া যাবে সে ছেলেই ততো যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

গরু খোঁজা ক'রে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল তাদের। দিন ক্ষণ দেখে দুই বয়স্ক অজ্ঞাতকুলশীলকে ধ'রে এনে একযোগে বিয়ে দেওয়া হ'লো দুই মেয়ের, দুই মেয়েই গলা ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল তাদের সঙ্গে। বাড়ি খালি হ'লো, হাল্‌কা হ'লো, খরচ কমলো।

৩

দারুকেশ্বরের মা অবোধের মতো কেঁদেছিলেন তাই নিয়ে, কচি মেয়ে দু'টোকে বুক থেকে ছিঁড়ে দিতে মরে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীলোকের চোখের জলে গলে যাবেন, এমন পাত্র পিতা-পুত্র কেউ-ই নন। অত দুর্বল হৃদয় নিয়ে তাঁরা সংসারে আসেন নি। সুতরাং কেঁদে কেঁদে নিজেই একদিন শান্ত হ'লেন তিনি।

দারুকেশ্বর গ্রামের ইস্কুলে তখন উঁচু ক্লাশের ছাত্র। ক্লাশ থেকে ক্লাশে সে উঠতে অনেকবার গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রায় সম্মুখীন হযেছেন, কেদারেশ্বর বললেন, 'থাক, আর তোর পড়ে কাজ নেই, যা হ'য়েছে ঐ যথেষ্ট। হিসাব নিকাশে মাথা আছে, বাজারের কালাচাঁদ বণিকের কাপড়ের দোকানে বসে যা। আমি কথা বলে এসেছি।'

পিতার এই প্রস্তাবে দারুকেশ্বর খুশিই হ'লেন। লেখাপড়া তাঁর ভালো লাগছিলো না। পিতার মতো তাঁরও অনর্থক মনে হচ্ছিলো ব্যাপারটা। কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুকে গেলেন কাজে। আব ঢুকেই মন লেগে গেল, আঁট ঘাঁট সব বুঝে ফেললেন। কয়েক মাসের মধ্যেই মাইনে বাড়িয়ে নিলেন দু'টাকা। শুধু তাই নয়, হাত সাফাই ক'রে দু'চার জোড়া ধুতি শাড়ি লংক্লথও আনতে পারলেন ঘরে। আরো কিছুদিন পরে, কোথায় কোন হাটে গেলে কোন জিনিস সস্তায় এনে দামে ছাড়তে পারবেন তার একটা পরিষ্কার হিসাব ঠিক ক'রে নিজের পয়সায় কিনে এনে অবসর সময়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রী কবতে লাগলেন সে সব।

বেশ দু'পয়সা আয় হ'তে লাগলো তাতে। এমন কি পিতাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু সঞ্চয় করতেও বেশী কষ্ট হ'লো না। কী বুঝতে পেরে মা বললেন, 'লেখাপড়া না হয় ছাড়লিই, তাই বলে ফাঁকির কারবার করিস না। সৎপথে থাকিস।' ভুরু কুঁচকে দারুকেশ্বর বললেন, 'থামো, যা বোঝো না তা নিয়ে গ্যাজ গ্যাজ কোরো না।'

এর পরে বিবাহ। মেয়েদের বিদায় দিয়ে শূন্য বাড়িতে মন টিঁকছিলো না দারুকেশ্বরের মায়ের। প্রস্তাবটা তিনিই করেছিলেন প্রথমে। প্রথমে কেদারেশ্বর আপত্তিও করেছিলেন যথারীতি। কেননা স্ত্রী কিছু বললেই তিনি মনে করেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অপব্যয় লুকিয়ে আছে। আর থাকেও তাই। বছরের মধ্যে কতোবার যে তিনি মেয়েদের আনতে বলেন, তার ঠিক নেই। কোনো উপলক্ষ্য হ'লেই জামাইদের কাপড় পাঠাতে বলেন। কোনো আত্মীয় আসবে শুনলে নেচে ওঠেন, এতো দুর্মূল্যের বাজারেও তিনি রোজ মাছ আনবার পরামর্শ দেন। নিজেদের রান্নাঘরের পিছনের ছাইয়ের গাদায় যে কতো কুমড়া আর চালকুমড়া ধরেছে, তার ঠিক নেই, তবু রোজ বাজারে পাঠিয়ে আলুটা বেগুনটা না আনলে তাঁর মন ওঠে না। সুতরাং ছেলের বিয়ে দিয়ে মানুষ বাড়িয়ে খরচ বাড়াতে যে তাঁর খুব সুখ এতো জানা কথাই। তাই অনেকদিন পর্যন্ত কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু তারপরে নিজেই বিবেচনা করতে লাগলেন কথাটা। কিছু টাকা কড়ি দরকার। বেশ কিছু নগদ টাকা। উদ্দেশ্য কালাচাঁদ বণিকের প্রতিযোগী হ'য়ে আর একখানা বড়ো দোকান খোলা। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, লোকেদের সাধ-আহ্লাদ বেড়ে গেছে

অনেক, সখ বেড়েছে। সখের ঠেলায় ঘরের পয়সা পরের পেটে দিয়ে বোকাগুলো অপ্রয়োজনে কেবলি কিনছে, আনছে, ছিঁড়ছে আর ভাঙছে। আর তার সব মজা গ্রামের ঐ একটা লোক লুটছে, গ্রামের ঐ একখানা দোকান বলে।

বাবুগিরির সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ চৌধুরাবাড়ি। যেমনি মেয়েরা তেমনি পুরুষেরা। দু'টো ছেলেকে আবার বুড়ো চৌধুরী কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন। কেদারেশ্বর স্বচক্ষে দেখেছেন তারা চিনেমাটির বাসনে ভাত খায়, কাচের গ্লাসে জল খায়, খুটমুট ক'রে ইংরিজি বুলি ছাড়ে। অসভ্য। ম্লেচ্ছ। খরচে! ভাগ্যিস তার ছেলেটা সে রকম না।

ছেলেটা নাই বা হ'লো, তাঁর গর্ভধারিণীটির তাই পছন্দ। মেয়েমানুষের বুদ্ধিই আলাদা। তিনি নিতান্ত কড়া মানুষ বলে, নইলে লোকের সংসার বারো ভূতে খায়, তাঁর সংসার তাঁর একটা স্ত্রাতেই চেটেপুটে খেয়ে নিতে পারতো।

তবু শেষ পর্যন্ত বেশ ভালো ক'রে ভাবলেন কথাটা। তারপর ঘটক লাগালেন। সেই সঙ্গে বাজারের সবচেয়ে ভালো জায়গায় একটি দোকানঘরও খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। টাকাটা হাতে পেলেই যাতে শুভদিন দেখে আরম্ভ ক'রে দিতে পারেন ব্যবসাটা।

সব শুনে দারুকেশ্বরের মা বললেন, 'তুমি কেবল টাকাটার কথাই ভাবছো। একটা ছেলে, তার বৌ আমি সুন্দরী না হ'লে আনবো না।'

'কী!' লাল চক্ষু ক'রে কট্‌মটিয়ে স্ত্রীর দিকে এমন ক'রে তাকালেন কেদারেশ্বর যে তারপর আর কথা বেশী এগুলো না। এগিয়ে এলো বিয়ের দিন। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সবদিকে মনোমতো পাত্রী পাওয়া গেল একটি। দোষের মধ্যে রংটা

ভীষণ কালো। কেদারেশ্বর দেখে এসে একটু বিমনা হ'লেন। অত কালো বৌ আনতে একটু তাঁর দ্বিধা হ'লো। নিজের জন্য নয়, নিজের স্ত্রীর কথা ভেবেও নয়, ভাবলেন ছেলের কথা। ছেলে বড়ো হ'য়েছে, যোগ্য হ'য়েছে, বলা যায় না শেষে রুষ্ট না হয়। নিজের অল্পবয়সের কথা মনে পড়লো তাঁর। বৌ ভাবতেই একটি আলতা-পরা ঘোমটা-টানা টুকটুকে মেয়েকে ভাবতেন তিনি। তা টুকটুকে বৌ-ই এনে দিয়েছিলেন তাঁর মা তাঁকে। সাত গ্রাম তোলপাড় ক'রে কাঁচা সোনার মতো রংয়ের বৌ এনেছিলেন তিনি। ধুম ধাড়াক্কা করেছিলেন খুব। তা আর করবেন না কেন, মেয়েমানুষ মাত্রই উড়ণচণ্ডী। স্বামী দু'চোখ বুজলো তো খুঁটি ছাড়া গরু। সব মুড়ে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত। পৈতৃক বিত্তের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই জীর্ণ বাড়িটি, মজা পুকুরটি আর সোনার বরণ স্ত্রীটি—এই তো জুটেছিলো কপালে!

সুন্দরী বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রথম অবিশ্যি ভালোই লেগেছিলো। এতোকাল পরেও মনে মনে সেটা স্বীকার না ক'রে পারলেন না কেদারেশ্বর। কিন্তু তার মেয়াদ ক'দিন। দু'দিনেই পুরোনো কাঁথা। ব্যবহারে কোনো জিনিসের আর দাম থাকে না। এ তো স্ত্রী-ই, চাইলেই যাকে পাওয়া যায়। তিন ছেলের মা হ'য়ে আর কী বা অবশিষ্ট রইলো। আর কী বা লাভ হ'লো ফর্সা বৌ জুটিয়ে। মেয়ে দু'টো বংশের মতো কালো, ছেলেটা ফর্সা। ছেলের আবার ফর্সা আর কালো। না, হিসেব ক'রে দেখলে এই সুন্দরী বৌ দিয়ে বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি তাঁর। খাটতে পিটতেও যে মানুষটা খুব ওস্তাদ তা-ও নয়। কেবল বায়নার রাজা।

ভেবে ভেবে একদিন ছেলেকেই ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কালো মেয়ে বলে দারুকেশ্বরের কোনো আপত্তি আছে কি না। দারুকেশ্বর অনেকক্ষণ লজ্জায় অধোবদন থেকে মৃদুস্বরে বললেন, 'দেবে থোবে কী রকম?'

খুশি হয়ে গোঁফের ফাঁকে হাসলেন কেদারেশ্বর। এরই নাম বাপ্‌কা ব্যাটা। ভরা গলায় বললেন, 'কালো রং ঢেকে দিতে যতো লাগে!'

দারুকেশ্বর তখুনি নত দৃষ্টিতে সম্মতি জানালেন। মনে মনে বললেন রাত্রিবেলা নিয়ে শুতে সব মেয়েই এক রকম, সে কালাই হোক আর ধলাই হোক। সারাদিন কাজকর্ম ছেড়ে কোন্ পুরুষ বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকে। কাজই আসল, আর কাজের বিনিময়ে টাকা। কালাচাঁদ বণিকের কাপড়ের দোকানের পাশে তাঁর দোকান যদি একদিন ঝল্‌মলিয়ে ওঠে, সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। সেটাই এখন দারুকেশ্বরের একমাত্র স্বপ্ন। বৌ যেমন চেহারারই হোক, সেই স্বপ্ন সার্থক করার মতো সম্পদ যদি নিয়ে আসতে পারে তা হ'লেই হয়।

কেদারেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে সব ঠিক ক'রে ফেললেন আর কেদারেশ্বরের স্ত্রী অন্য আরো অনেকবারের মতো আরো একবার মন খারাপ ক'রে চোখের জল মুছলেন।

৪

শেষ পর্যন্ত বৌ দেখে কিন্তু খুব হতাশ হ'লেন না দারুকেশ্বরের মা। রং যতোই কালো হোক, মেয়েটির মুখে বেশ লালিত্য আছে, চেহারাটা ছিপছিপে। দারুকেশ্বরের মতো বেঢপ চেহারার

ছেলের এইরকম ছিপছিপে বৌ-ই দরকার ছিলো। এর উপরে বৌ-ও যদি মোটা হ'তো তা হ'লে ছেলেপুলে সব তেলের পিঁপে হ'তো। দারুকেশ্বরের বয়স মাত্র তেইশ। এরই মধ্যে দাড়িতে গোঁফেতে আর বুকের লোমে মনে হয় যেন ছেচল্লিশ বছরের ভদ্রলোক। কেবল রংয়েরই জৌলুষ।

মোট কথা, বৌ খুব পছন্দ হ'লো দারুকেশ্বরের মায়ের। শান্তশিষ্ট ভদ্র মেয়ে। মনটা সরল উদার। দু'দিনেই তিনি তাকে মেয়ের মতো বুকে টেনে নিলেন। এতদিনে তাঁর শূন্য শুষ্ক সংসারটাতে একজন মনের মতো মানুষ পেয়ে, বন্ধু পেয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পেলেন তিনি। শাশুড়ির মতো বৌ-ও তাঁকে মা বলে মেনে নিতে দেরি করলো না। স্বামীকে আর শ্বশুরকেও ঠিক বুঝতে পেরে গেল। বুঝতে পারলো সংসারটা স্ত্রীলোকের অধীন নয়, একান্তভাবেই পুরুষশাসিত। এ সংসারে তাঁর শাশুড়ি দাসী বই কিছু নয়, আর সে-ও তাই। সুতরাং সমদুঃখী-দু'টি স্ত্রীলোক সহজেই দু'জনের কাছে দু'জনে প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠলো।

এদিকে শাশুড়ি বৌয়ে যতো ঘনিষ্ঠতা বাড়লো, দোকান ক'রে বাপে ছেলেতে ততোই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে লাগলো। টাকাকড়ি নিয়ে ঘন ঘন তাঁদের খিটিমিটি বাধতে লাগলো। টাকার প্রতি আসক্তি দু'জনেরই যেখানে সমান, লুব্ধতায় দু'জনেই যেখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছেন সব সময়ে, সেখানে এই সংঘর্ষ অনিবার্য। তার উপরে বিয়ে ক'রে থেকেই দারুকেশ্বরের একটা আলাদা আলাদা ভাব আরম্ভ হ'য়ে গেছে। কোনোদিনই তিনি কারোকে একাত্ম ভাবেন নি তবু যতোদিন বিয়ে করেন নি, স্বার্থটা অন্তত এক ছিলো। বিয়ের পরে

বাধ্যত না হ'লেও মনের ভিতরে তাঁর ছুটো সংসার আলাদা হ'য়ে গেল।

দারুকেশ্বরের সংসার শুধু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে, কিন্তু কেদারেশ্বরের সংসারে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ছু'ঘর কুটুম্বও আছে। স্বামীর হাজারো নিষেধ শাসন অবহেলা ক'রে তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ দারুকেশ্বরের মা বছরে অন্তত ছু'বার কেঁদেকেটে মেয়েদের আনাবেনই আনাবেন। পুজোয় ষষ্ঠীতে কাপড় দেবেন, নাতিনাতনীর জন্য লাড়ু মোয়া আচার আমসত্ব বানিয়ে জলের মতো পয়সা নষ্ট করবেন। এগুলোর ভাগ দিতে যাবেন কেন দারুকেশ্বর? ওরা কি তাঁর মেয়ে? তাঁর নাতিনাতনী? এটাই দারুকেশ্বরের আসল আপত্তি।

ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে শেষে আগুন লাগলো একদিন। একদিন প্রায় লাঠালাঠি ক'রে বাপ ব্যাটা আলাদা হ'য়ে গেল। হিসাবে একটা মস্ত গোলমাল করেছিলেন দারুকেশ্বর। কেদারেশ্বর কেন সেটা সহ্য করবেন। দাঁত কিড়মিড় কবলেন তিনি, যা তা বলে গাল দিলেন ছেলেকে, এরকম করলে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেও শাসালেন।

চোখ পাকিয়ে ঘাড় তেরচা ক'রে দারুকেশ্বরও জবাব দিতে ছাড়লেন না। দোকান খুলবার মুলধনটা যে কেদারেশ্বরের নয়, দারুকেশ্বরেরই বিবাহের যৌতুক, এ কথাটা অনেকবার মনে করিয়ে দিলেন।'

কেদারেশ্বর বললেন, 'কক্ষনো না।'

দারুকেশ্বর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

কেদারেশ্বর বললেন, 'মিথ্যাবাদী।'

দারুকেশ্বর বললেন, 'চোর।'

কথার পৃষ্ঠে কথা। বলতে বলতে আর মুখের লাগাম রইলো না কারো। সংযমেরও প্রশ্ন উঠলো না কোনো। এর পরে কেদারেশ্বর ঘাড় ধ'রে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিলেন ছেলেকে। দারুকেশ্বরের মা বৌকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সাত মাসের পোয়াতি বৌ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। দারুকেশ্বর এক হ্যাঁচকা টানে তাকে ছিনিয়ে নিলেন মায়ের কাছ থেকে, এক জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন সেই রাত্রির জন্য। পরের দিন সকালে কেদারেশ্বর দোকান খুলতে গেলে, বাড়িতে এসে নিজের জিনিসপত্র সব বুঝেসুঝে নিয়ে চলে গেল। মা কিছু বললেন না, দেখলেন না, রান্নাঘরে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

সেই দিনই দুপুরে বৌ নিয়ে দারুকেশ্বর গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন কোথায়। আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই কেদারেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে, দুই চোখে অন্ধকার দেখলেন। দেখা গেল তাঁর অতি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা টাকার থলেটি নেই।

আসলে দারুকেশ্বরের মা দুঃখে-কষ্টে অভিভূত হ'য়ে যতক্ষণ কাঁদছিলেন রান্নাঘরে বসে, ততোক্ষণে দারুকেশ্বর ভালোভাবেই গুছিয়ে নিয়েছেন সব। শুধু যে বাবার টাকার থলিটি নিয়েই তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন তা নয়, মায়ের যৎসামান্য সোনাদানাটুকুও ছেড়ে যাননি। নিজের স্ত্রীর তো নিয়েইছেন। কেদারেশ্বর উথাল-পাথাল করতে লাগলেন। টাকার শোকে পাগলের

মতো হ'য়ে খাওয়া-দাওয়া ছাড়লেন, একটা রাম-দা নিয়ে হা রে রে রে বলে টহল দিতে লাগলেন বাড়ির চারদিক। আর তাঁর স্ত্রী শুকনো ফুলের মতো নেতিয়ে পড়লেন বিছানায়।

পাড়ার লোকেরা, জ্ঞাতি-গুষ্ঠিরা, কাছে এসে সহানুভূতির ছুতোয় দুঃখের আগুনে ইন্ধন জোগাতে লাগলো, আড়ালে খুশি হ'য়ে বলতে লাগলো, 'বেশ হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে।'

সবচেয়ে বেশী খুশি হ'লো কালাচাঁদ বণিক, বারোয়ারী কালীতলা গিয়ে সে পাঁচ সিকের পূজো দিয়ে এলো।

আর দোকান করবে কে? দোকানে আছে কী? থাকলেও দেখবার মতো অবস্থা কোথায় আধ-পাগলা কেদারেশ্বরের? সারাগ্রাম ঘুরে ঘুরে এর ওর কাছে তিনি ছেলের কুৎসা গাইতেই ব্যস্ত হ'য়ে রইলেন আর চোখ পাকিয়ে ঘুষি বাগিয়ে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন প্রাণপণে। তারপর সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে এসে দেয়ালের শূন্য ফোঁকরে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন টাকার থলিটির জন্য।

৫

এই গুপ্ত ফোঁকরটি তাঁর বুদ্ধিতে নিজের তৈরী ছিলো। দেখতে কুলুঙ্গির মতো, সামনের দিকে তেল সিঁদুরে চিটচিটে ক'রে লক্ষ্মীর পট বসানো, পিছনে মাটির রংএ কাঠ দিয়ে অদ্ভুতভাবে মিশিয়ে ভিতরে ফাঁপা রেখে এক ছোট্ট খুপরি। কেদারেশ্বরের স্ত্রীও জানতেন না এই কুলুঙ্গিটির রহস্য। দারুকেশ্বর যে কী ক'রে জানলেন কে জানে। দারুকেশ্বরের

জন্মের আগে থেকে এইখানে তিনি টাকা লুকিয়ে রাখেন। তা ছাড়া কোথায় রাখবেন? যেখানেই রাখুন স্ত্রী তো জানবেনই? বলা কি যায়, একদিন বাক্স ভাঙতে কতক্ষণ। মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই।

লোকেরা বলতো কেদারেশ্বরের টাকা মাটিতে পোঁতা আছে। কোনখানে পোঁতা আছে কে জানে, যদি খুঁজতে হয় খোঁজো। ভাঙো সারা বাড়ি। তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বার করতে পারবে না। মরবার আগে প্রাণেধরে নিশ্চয়ই বলে যাবেন না কাউকে, ছেলেকেও নয়, ঐ টাকা ঐ মাটির তলাতেই চাপা পড়ে থাকবে।

কিন্তু কুলুঙ্গির কল্পনা কারো মনে আসেনি। তিনি নিজে থাকেন সে-ঘরে প্রহরী হয়ে। সেটা তাঁর শোবার ঘর। দারুকেশ্বর কী ক'রে টের পেলেন? তবে কি শৈশবের কোনো স্মৃতি তাঁকে নিয়ে গেছে সেখানে?

ঠিক। তাই ঠিক! হয়তো শিশু বলে গ্রাহ্য না ক'রে কোনো একদিন দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি লক্ষ্মীর পটটি সরিয়েছিলেন, বসে বসে দেখেছিলো সে। সেই পটটি। কিন্তু সে কবে? কবে? কবে এই পাপ করেছিলেন কেদারেশ্বর? সেই কুলাঙ্গারটাকে কবে তিনি এই স্বর্গের সিঁড়ি দেখিয়েছিলেন? ভাবতে ভাবতে কেদারেশ্বর চুল ছেঁড়েন। আর তাঁর স্ত্রী, যার রং তপ্তকাঞ্চনের মতো, যিনি দুর্বল, নরম, ভীরু, তিনি এক পলকে তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বামীর বদলে ছেলের মুখটা ভেসে ওঠে চোখে, কতোক্ষণ পরে স্বামী আর ছেলে একটা মানুষ হ'য়ে যায়। একটা দেহ, একটা

আত্মা। বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে তাঁর। ধড়ফড়িয়ে শুয়ে পড়েন! পৃথিবী থেকে বাতাসটা কমে যায়।

এই ক'রে ক'রেই কাটতে লাগলো দিন। তারপর মাস তিনেকের মাথায় কোনো এক রাত্রে ঘুমের মধ্যেই মারা গেলেন দারুকেশ্বরের মা। নিঃসঙ্গ কেদারেশ্বর টাকার শোক ভুলে স্ত্রীর শোকে অভিভূত হ'লেন। জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন স্ত্রীকে তিনি টাকার চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

এদিকে দারুকেশ্বর তাঁর মাতৃভূমি নন্দন গ্রাম থেকে বেরিয়ে সোজা ট্রেনে চেপে কলকাতা চলে এলেন। পথে নালতা গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে এক বেলার জন্য উঠে বৌকে রেখে এলেন সেখানে। কথা থাকলো তিন মাস পরে বাচ্চা হ'য়ে গেলে, বাসাবাড়ি ঠিক ক'রে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা দারুকেশ্বরের অচেনা শহর নয়, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকবার তাঁকে আসতে হ'য়েছে এখানে, দোকানের জিনিসপত্র কিনে কেটে নিয়ে যেতে হ'য়েছে। কেদারেশ্বরের সঙ্গে টুকটাক ঝগড়া-ঝাঁটির শুরু থেকে আরো বেশী এসেছেন। বড়োবাজারের গদিতে থেকেও গেছেন দু' চার রাত। খোঁজ খবর নিয়েছেন এখানে এলে তাঁর কী রকম সুবিধে হ'তে পারে। এই বড়ো ঝগড়ার দু' সপ্তাহ আগে এসে একেবারে আঁট ঘাট বেঁধে গিয়েছিলেন। সুতরাং গুছিয়ে বসতে অসুবিধে হ'লো না কিছু। আপাতত অন্যের দোকানেই কর্মচারী হ'লেন, ইচ্ছে রইলো সুবিধে মতো একটি ভালো ঘর পেলেই একা হ'য়ে আলাদা দোকান দেবেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন নন্দন গ্রামে ব্যবসা জমানো আর কলকাতা এসে ব্যবসা জমানো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। গ্রাম আর শহর দুই বিপরীতগামী স্থান। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই। এখানকার দূর্বাঘাস মাটি

যেমন সিমেণ্ট কংক্রীটে চাপা পড়ে গেছে, মানুষের হৃদয়ও তেমন আন্তরিকতার অভাবে শুষ্ক। আকাশ-বাতাস, জল-জঙ্গলে গ্রামের মতো এটা ভিজে জায়গা নয়। এখানে গ্রাম সুবাদে জ্যাঠা কাকা খুড়ি জ্যেঠির আব্দার চলে না। এখানে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। লজ্জার দায়ে আত্মীয়তার দায়ে মনোমালিন্যের দায়ে কেউ এসে তার দোকানে ভিড় জমাবে না। দশ দোকান আছে, ঘুরবে, ফিরবে, দেখবে, শুনবে, বাছবে, তবে কিনবে। পয়সা দিয়ে জিনিস নেবে তার আবার মুখ চেনাচেনি কী? খাতির পিরীত কী?

বেশ হতাশ হ'লেন দারুকেশ্বর। ভেবেছিলেন কলকাতা এসেই রাজা হ'য়ে যাবেন। গদির ব্যবসায়ীরা তাঁকে তেমনিই বুঝিয়েছিলো। আর তাই তিনি আরো কিছুদিন বাপের ভাত না খেয়ে তাড়াতাড়িই ঝগড়া লাগিয়ে ছুতো ধ'রে চলে এলেন। হয়তো ঠিকই বুঝিযেছিলো, তারা সব পুরোনো ঘাগী লোক, কতদিন ধ'রে এসে বসেছে, জমিয়ে নিয়েছে, হাজার হাজার টাকার লেন দেন করছে এই কাপড় বেচে। কিন্তু একজন গ্রাম্য নতুন ব্যবসায়ীর পক্ষে উজিয়ে ওঠা যে কতো কঠিন ব্যাপার সে কথা ভাবেনি তারা। কী আর করা যায়! এসে যখন পড়েইছেন, লেগে থাকতেই হবে, 'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন' এই বীজ মন্ত্রটি জপ করতে করতেই এগুতে হবে আলোর দিকে।

সুতরাং টাকার থলিটি বালিশের খোলে তুলোর মধ্যে ভ'রে রেখে, সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবিতে খুব কষে মাথা ঠুকতে থাকলেন ভক্তিভরে। সকালবেলা যারা পিতলের সাজিতে ফুল

বেলপাতা চন্দন নিয়ে দোকানে দোকানে ফোঁটা দিয়ে যায়, তাদের পায়ের ধূলো নিতে লাগলেন প্রত্যেকদিন।

ততোদিনে দাদার বাড়িতে শুয়ে শুয়ে তাঁর স্ত্রী মন্দাকিনী অতি সন্তর্পণে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন। এতো নিঃশব্দে একটি মানবশিশুকে তিনি পৃথিবীতে এনে ফেললেন যে, বলতে গেলে কেউ প্রায় টেরই পেলো না, দাই আনবার পর্যন্ত তর সইলো না। ননদের দিকে তাকিয়ে তার বৌদি অবাক হ'য়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'এ কেমন বিয়োনী গো। একটু শব্দ করলে না?'

দেখা গেল মেয়েটি তার বাপের মতোই ফর্সা হ'য়েছে। সবাই খুব খুশি হ'লো। শুধু মন্দাকিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে ভাবলেন চেহারাটা যেমন তেমন, স্বভাবটা যেন বাপের মতো না হ'য়ে ওর ঠাকুমার মতো হয়। আর ঠাকুমার কথা ভেবে মন্দাকিনীর দুই চোখ জলে ভ'রে গেল। কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বালিশটা ভিজে গেল।

টেলিগ্রাম গেলো দারুকেশ্বরের কাছে।

খবর পেয়ে দশদিনের দিন মেয়ে দেখতে এলেন দারুকেশ্বর। ভাগ্যটা তার সবরকমেই খারাপ চলছে। নইলে ছেলে না হ'য়ে একটা মেয়ে হবে কেন? এই বংশে মেয়েই বেশী হয়, কিন্তু সর্বদাই প্রথমটি হয় ছেলে। কী জানি তার ভাগ্যে কী আছে! হয়তো মেয়েই হ'তে থাকবে ক্রমাগত, ছেলে আর হবেই না। এই মেয়ে হ'য়েছে জেনেই আসবার ইচ্ছে ছিলো না তাঁর। কিন্তু এখান থেকে আসবার জন্য যে রকম তাগাদা দিচ্ছিলেন এঁরা,

কর্তব্যের দায়ে রেলভাড়া খরচ ক'রে আসতেই হ'লো। কে জানে না এলে আবার রাগ ক'রে ভাইগুলো হয়তো রাখতেই চাইবে না বোনকে। বিধবা মা, তাঁর আর কতোটুকু জোর। আর না রাখতে চাইলে মহা বিপদে পড়ে যাবেন। আবার একটা ট্যাঁ ভ্যাঁ হ'য়েছে, তাকে শুদ্ধ তখন কোথায় নিয়ে তুলবেন?

কিন্তু এসে ভালোই হ'লো দারুকেশ্বরের। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে তিনি নতুন আশার আলো দেখতে পেলেন। কলকাতা শহর তখন ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ছে, দক্ষিণের দিকে বেড়ে বেড়ে ওদিকে ভবানীপুর ছাড়িয়ে প্রায় টালিগঞ্জের পুল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর এদিকে বালিগঞ্জ। ভদ্রলোক কন্‌ট্রাকটার, প্রচুর উপার্জন করছেন, প্রচুর কাজ হাতে পেয়েছেন। একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন, যিনি তাঁর সব কাজেই সহায় হ'তে পারেন। এবং সেটা কী ধরনের কাজ হবে তা-ও তিনি দারুকেশ্বরকে বুঝিয়ে দিলেন। দারুকেশ্বর কাজটাও বুঝলেন, সেই সঙ্গে কন্‌ট্রাকটারের মনোগত বাসনাটিও বুঝে নিলেন। আসলে দারুকেশ্বরের মতো একজনকেই তিনি চান। সমস্ত বিষয়টা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন ক'রে ভালোভাবে এক রাত চিন্তা করলেন দারুকেশ্বর। এক পেশা থেকে অন্য পেশায় বদলে আসা মানেই সেই ব্যবসাতে ইতি দেয়া। অল্প বয়স থেকে কাপড়ের বাণিজ্যেই তিনি পারদর্শী হ'য়েছেন, এখন ইঁট চুন সুরকি বালির রহস্য কতোটা উদ্‌ঘাটন করতে পারবেন কে জানে। শুনে অন্তত কিছু গুরুতর বলে মনে হ'লো না। তা ছাড়া কথা বলে কন্‌ট্রাকটারটিকে তাঁর ভালোমানুষ বলেই ধারণা হ'লো। সেই ভালোমানুষের সহকারী হওয়া মানে ধীরে ধীরে তাঁকেই সহকারী করা। দারুকেশ্বরের এক দাঁতের বুদ্ধিও

মানুষটির আছে বলে মনে হয় না তাঁর। তবু আরো ভালো ক'রে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে দু'দিন বেশী রইলেন তিনি শ্বশুরবাড়িতে, সেই দু'দিনেই তাঁর দিব্যদৃষ্টি তাঁকে বুঝিয়ে দিল বালি সিমেণ্ট লোহা লক্কড়ের মধ্যে তাঁর জন্য অনেক রস নিহিত আছে এবং সেই রস তিনি অতি সত্বরই নিংড়ে নিতে পারবেন। এর পরে এক ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় যোগদান বিষয়ে মনের মধ্যে তিনি এক তিল দ্বিধা না রেখে মনস্থির ক'রে কলকাতা ফিরে এলেন।

২

বড়োবাজার অঞ্চলে, বড়ো রাস্তা থেকে কিছু অলিগলি পেরিয়ে তবে দারুকেশ্বরের আস্তানা। ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একা থাকেন দারুকেশ্বর। যার দোকানে কাজ করেন, তাঁর বাড়ি অবিশ্যি কিছুটা দূরে, আরো ভিতরে। একবার ভাবলেন প্রথমে সেখানে গিয়ে কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসে গোছগাছ ক'রে সোজা চলে যাবেন ভবানীপুরে। আবার ভাবলেন, কাজে যখন লেগেছিলেন, দোকানে তখন কোনো লোকের দরকার ছিলো না। বলতে গেলে তাঁর কথাবার্তা শুনে, অসহায় অবস্থা ভেবে, পুরোনো পরিচিত খদ্দেরের উপর নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়েই তাঁকে বহাল করেছিলো দোকানের বুড়ো মালিক। আর বহাল হ'য়েই দারুকেশ্বর ভেবেছিলেন স্ূচ হ'য়ে ঢুকে এবার কখন ফাল হ'য়ে বেরোবেন। তারপর মাসখানেকের মধ্যেই এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে কান ভারি ক'রে তাকে তাড়িয়ে পাকা হ'লেন। মনিব এখন তাঁকেই বিশ্বাস করে, নির্ভর করে,

বলা যায় না হঠাৎ যেতে চাইলে সে কী ব্যবহার করবে। এসব লোককে বিশ্বাস নেই, হয়তো আটকে দেবে, ছাড়তে চাইবে না। বুড়ো তো চালাক কম নয়। মুখে যতো ভালো ব্যবহারই করুক তলায় তলায় ঠিক নিজের স্বার্থে হুঁসিয়ার। আসলে টের পেয়েছে, কিছু রসদ আছে দারুকেশ্বরের হাতে। এখন কি আর সহজে ছাড়বে? তার চেয়ে আগে নিজের ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে আসা যাক তারপর দোকানে গিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা ক'রে তার হালচাল বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

মনস্থির করবার পরে পথের দোকান থেকে কিছু পুরি হালুয়া কিনে ঘরের দরজার ডবল তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন দারুকেশ্বব। ঘুটঘুটি অন্ধকার, জানালাগুলো সব বন্ধ ক'রে গিয়েছিলেন যাবার সময়ে। চৌকাঠে হুঁচোট খেলেন একটা। আবার বাধা। নিজের ঘরে নিজে ঢুকবেন তাতে আবার বাধা কী? তবু সংস্কারবশত দাঁড়ালেন একটু।

দরজা জানালা বন্ধ থাকলে কী হবে, সারাঘরে ধুলো পড়েছে পাৎলা সরের মতো। এখন আলো পেয়ে, হাওয়া পেয়ে, মানুষের সাড়া পেয়ে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'যে উডতে শুরু করলো। চারমাসের বসবাস করা ঘর। দারুকেশ্বর তীক্ষ্ণ চোখে সব দেখে নিলেন এক নজর। জানালার তাক থেকে খাডা ক'রে রাখা কলাই করা থালাটা টেনে এনে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে, কাপড়ের কোঁচা দিয়ে মুছে, খাবারের ঠোঙাটা রাখলেন। তারপর ঘরের কোণ থেকে জলেব কুঁজোটা আব মগটা নিয়ে চলে এলেন উঠোনের বারোয়ারী কলতলায়। সকাল আটটা। ভিড়

লেগেছে খুব। তারি মধ্যে এগিয়ে গেলেন তিনি, ক'দিন পরে আজ এসেছেন দেখে প্রত্যহের পরিচিত মুখে সম্ভাষণের হাসি ফুটলো, তারা সবাই সরে দাঁড়িয়ে পথশ্রমে কাতর মানুষটিকে সবার আগে জল নিতে দিল। ঘরে এসে দারুকেশ্বর আবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। দেয়ালের কোণে দড়ির খাটিয়ায় বসে ভেজা-মুখ গামছা দিয়ে মুছলেন, খাবারের থালাটা টেনে নিলেন কোলের উপর। ঘরটা খুব ছোট। কিন্তু বেশ এক কোণে, একা। দারুকেশ্বর নিজের বাড়ি থেকে যা যা জিনিস-পত্র সরিয়ে আনতে পেরেছেন তা সবই শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর হেপাজতে। এখানে একটি মাত্র ছোট্ট স্টীলট্রাঙ্ক আর সতরঞ্জি-মোড়া দড়ি-বাঁধা বিছানা, এই তাঁর সম্পত্তি। চার মাসের মধ্যে ঘর ছেড়ে রাত কাটাতে এই প্রথম তিনি বেরিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন দু'দিন আর এক রাত্রির জন্য, কন্‌ট্রাকটারের পাল্লায় পড়ে পুরো তিনদিন তিনরাত কাটিয়ে এই ফিরছেন :

এখানেও দোকানের মালিকটিকে প্রশংসা না ক'রে পারলেন না দারুকেশ্বর। যেতে চাওয়া মাত্রই একবাক্যে রাজি হ'য়ে ছিলো। বরং উৎসাহ দিয়েছিলো। বলেছিলো, যেখানে বৌ আছে সেখানে তো প্রত্যেক মাসে তোমার যাওয়া উচিত, তার ওপর নতুন মেয়ে হ'য়েছে। যাবে বৈ কি। নিশ্চয়ই যাবে। মাত্র একদিনের জন্য কেন চাও তো এক সপ্তাহের ছুটিও দিয়ে দিতে পারি আমি।

কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ দারুকেশ্বরের দৃষ্টিটা দেয়ালের কোণে গিয়ে থমকে গেল। ট্রাঙ্কটা কেমন বাঁকা হ'য়ে আছে না?

ঠিক ঐখানে তো রেখে যাননি তিনি। বিছানাটা রাখলেন উপরে আর ট্রাঙ্কটা রাখলেন নিচে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে সোজা ক'রে। তবে ট্রাঙ্কটা ওখানে বেঁকে গেল কেমন ক'রে? তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, বাতাসের বেগে কাছে গিয়ে কড়া টেনে পরীক্ষা করলেন, ঠিক চাবি বন্ধ আছে কিনা। সর্বনাশ ট্রাঙ্কটা যে খোলা! কে খুললে? কে ঢুকলো ঘরে? ঠিক মনে আছে যাবার সময় বাক্সটা খুললেন, ভিতরে বালিশটা ঢুকোলেন, ওপরকার খোপকাটা ট্রেটা আবার ঠিক মতো পেতে দিলেন তার ওপরে তারপর ডালা বন্ধ ক'রে চাবি লাগালেন। তিনবার চারবার টেনে দেখলেন ঠিক মতো লেগেছে কিনা। কেন দেখবেন না। ট্রাঙ্কটা কি শুধু একটা ট্রাঙ্ক? শুধু কতোগুলো ইস্পাত। প্রাণহীন কতগুলো মৃত ধাতুর স্তূপ। না কক্ষণো না। ট্রাঙ্কের বুকের মধ্যে রীতিমত তাঁর কলিজা আছে, সেই কলিজার স্পন্দন আছে, থেমে গেলে মৃত্যু আছে। জীবন না থাকলে মৃত্যু আসে কোথা থেকে?

ক্ষিপ্রহাতে বাক্সের ডালাটা তুলে দারুকেশ্বর সেই জীবনের সন্ধানেই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার শূন্য গহ্বরের দিকে। যে বালিসটার মধ্যে তাঁব প্রাণভোমরা লুক্কাযিত ছিলো সে বালিসটাকে কে যেন ফেঁড়ে ফুঁ'ফাঁক ক'রে বেখেছে।

যখন থেকে দারুকেশ্বর বাক্সটাকে সোজা বসানো না দেখে বাঁকা দেখেছেন তখন থেকে তাঁর বুকটার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ডুরন্ত ইঞ্জিন ধ্বক ধ্বক ক'রে চলতে আরম্ভ করেছে, এখন হঠাৎ ব্রেক না কষেই সেটা দপ ক'রে থেমে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য আর নিঃশ্বাস নিতে পারলেন না, নড়তে পারলেন না,

চোখের পলক ফেলতে পারলেন না। তারপর দৌড়ে এসে দড়িদড়া খুলে বিছানাটাকে হাঁটকাতে লাগলেন। ছোটো ছোটো ছু'টো বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোন দারুকেশ্বর। তার মধ্যে একটি রেখে গিয়েছিলেন বিছানার ভিতরে, অন্যটি ট্রাঙ্কে। বালিসটাকে ট্রাঙ্কে ঢুকোবার জন্য ট্রাঙ্ক থেকে অনেক জিনিস বার ক'রে বিছানায় বেঁধেছেন। যেমন, একটা সবুজ রংয়ের আলোয়ান, একটা গরম পাঞ্জাবী, তিনখানা ধুতি, মোটা বাঁধানো খাতা ছু'খানা, কাঠের ছোট আয়না, একপয়সা দামের একখানা কাকুই, এইরকম টুকিটাকি সব। সেই সবের জঞ্জাল সরিয়ে অন্য বালিশটা তিনি টেনে বার করলেন। ফেঁড়ে ফেললেন এক নিমিষে, তুলোগুলো ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আবার ছুটে গেলেন ট্রাঙ্কের কাছে, আবার দেখলেন আবার খুঁজলেন, শেষে মাথা চাপড়ে, বুক চাপড়ে প্রায় উচ্চস্বরে হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন।

৩

শুধু কি টাকা! সোনা! ছোটো ছোটো ইঁটই ছিলো কুড়িখানা। একেকখানার ওজন অন্তত পাঁচ ভরি। তুলোর পরতে পরতে বালিশের পাঁজরে লুকিয়ে শুয়ে থাকতো তারা। নিশ্চিন্ত। নির্ভয়। কেদারেশ্বর বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি জানতেন টাকার কোনো মূল্য নেই, মূল্য জিনসের। এবং সব জিনিসের মধ্যে সোনাই শ্রেষ্ঠ। এক টাকা ভেঙে কোনোদিন ছু'টাকা হবে না, কিন্তু আজকের ছু' টাকার সোনা কাল হয়তো ছু'শো টাকা হ'য়ে যেতে পারে। আরো ছিলো কেদারেশ্বরের থলিতে।

বড়ো বড়ো হীরে ছিলো তিনখানা, বেড়ালের চোখের মতো একখানা পাথর, আর একখানা লাল প্রবাল ছিলো, সময় সুবিধে মতো অথবা কারো দুঃসময়ের সুযোগে এই সব কিনে রেখেছিলেন তিনি। প্রায়ই ছেলেবেলাকার একটা ছবি ভেসে উঠতো দারুকেশ্বরের চোখে। তিনি তখন খুব ছোটো, কতো ছোটো তাও মনে নেই। তাঁর জ্বর হ'য়েছিলো, বার্লি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। বেলা তখন দশটা কি এগারোটা, এমন সময় জানালার বাইরে কে যেন ডাকলো কেদারেশ্বরের নাম ধরে। আর ডাকটা শুনেই অদ্ভুতভাবে ঘুমটা ভেঙে গেল বালক দারুকেশ্বরের। কিন্তু জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে থাকার মাঝখানকার একটা তন্দ্রা অনেকক্ষণ তাকে জড়িয়ে রইলো সারা শরীরে। জেগে উঠতে চেয়েও সম্পূর্ণ জেগে উঠতে পারলেন না। আস্তে আস্তে যখন চোখ খুললেন, দেখলেন জানালার বাইরে চৌধুরী বাড়ির বড়ো ছেলে, যার চেহারা দেবদূতের মত, যিনি একসময়ে দারুকেশ্বরেব বাবার সহপাঠী ছিলেন, যিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে বিলেত গিয়ে মস্ত ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছিলেন, যাঁকে গ্রামের লোক সেই কারণে ম্লেচ্ছ বলে সমাজে পতিত করেছিলো, তিনি জানালার শিক গলিয়ে বাবার হাতে কী একটা দিলেন; মৃদুগলায় বললেন, 'এর অনেক দাম। এসব জিনিস কেনবার মতো ধনী খুব বেশী নেই দেশে। এ আমার মুখেভাতে আমার বড়োলোক দাদামশাই দিয়েছিলেন।' দারুকেশ্বর চুপচাপ পড়ে থেকে বড়ো বড়ো চোখে দেখতে লাগলেন সেই রহস্যময় দৃশ্য। কেদারেশ্বর ফিস-ফিসিয়ে বললেন, 'সাচ্চা তো?'

চৌধুরীবাবু বললেন, 'সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ হয়?'

'না, না। তোমাকে আমি কখনোই সন্দেহ করি না। তা হ'লে সত্যি তুমি জাত খোয়াবে?'

'এ কথা বোলো না কেদারেশ্বর। সেটা গুণীজ্ঞানীর দেশ।
সকল বাধা বিপত্তি এড়িয়ে আমি যাবোই সেখানে।'

'এভাবে তুমি কতো টাকা সংগ্রহ করবে?'

'যা পারি, যতোটা পারি। এ ছাড়া আমার আরো কিছু নিজস্ব সম্পত্তি আছে, ভাইদের ভাগে একফোঁটা কম না ফেলে—' বলতে বলতে চৌধুরীবাবু পিছন ফিরে তাকিয়ে থামলেন। আস্তে বললেন, 'আমি তোমাদের ধানের মরাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি টাকাটা নিয়ে এসো। আজই কলকাতা যাবো।'

উনি চলে গেলে কেদারেশ্বর জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন, এদিকে এসে ভিতর দিকের দরজাটাও বন্ধ করলেন। বিছানায় শায়িত রুগ্ন পুত্রের কথা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তাকে খেয়াল না ক'রেই সেই বন্ধ ঘরের আবছা অন্ধকারে সন্তর্পণে কুলুঙ্গিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। থরো থরো হয়ে দেখতে লাগলেন দারুকেশ্বর এরপরে কী হয়। সত্যি সত্যি কী যে হ'লো তা অবিশ্যি আর তিনি বুঝতে পারলেন না। শুধু মনে হ'লো লক্ষ্মীর পটের পিছনে যেন আরো কী আছে। যেন কোনো ভীষণ ষড়যন্ত্র। তাঁর ভয় করতে লাগলো। তিনি চোখ বুজলেন।

তারপরে কতোদিন তিনি সেই ছেলেমানুষী কৌতুহলে কতোবার সেই কুলুঙ্গির তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মাথার থেকে এক হাত উঁচু কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে কতোবার ভেবেছেন কবে বড়ো হ'য়ে সেখানকার সব রহস্য উদ্ঘাটন করবেন।

তারপর সত্যি সত্যি বড়ো হ'তে হ'তে কখন ভুলে গিয়েছেন সেই বিস্মৃতির বয়সের খেলাধুলা।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই, ঝগড়া লাগবার দু'দিন আগে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ছবিটা। সন্ধ্যাবেলা, নির্জন ঘরে কী জানি কী কারণে বাবার শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন, দেখলেন কেদারেশ্বর লক্ষ্মীর পটের দিকে মুখ ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম করছেন। বিষয়টা কিছুই না। এই সময়ে সব গৃহস্থই শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়েছে, তাঁদের লক্ষ্মীর তাকেও ধূপধুনোর গন্ধ। বাড়ির কর্তা সেই সন্ধিক্ষণে প্রণাম করছেন তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে। খুব সাধারণ ঘটনা, স্বাভাবিক দৃশ্য। তবু চমকে গেলেন দারুকেশ্বর। হঠাৎ সেই ছেলেবেলাকার বুক ঢিপ ঢিপ করা আতঙ্কটা তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। নিঃশব্দে ফিরে গেলেন তিনি। কিন্তু ভুলতে পারলেন না। শুধু যে সেই সন্ধ্যা আর সেই রাতই ভুললেন না তা নয়। পরের দিনও অন্যমনস্ক হ'য়ে সেই একই কথা ভাবলেন। আর তারপর—তারপর—

তারপর কী? অত কাণ্ড ক'রে সব রহস্য ফাঁক ক'রে আল্লাদীনের যে আশ্চর্য প্রদীপ তিনি একান্ত আগ্রহে সংগ্রহ করলেন, কোথায় গেল সে প্রদীপ? কোথায়? কোথায়? কেমন ক'রে গেল! কে দেখলো সেই প্রদীপের গোপন ভাণ্ডার! কেমন ক'রে দেখলো! কে আসে তাঁর ঘরে? না, কেউ না, কেউ না। কাউকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেন না, দরকার পড়লে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলেন, কিন্তু চৌকাঠের এপিঠে নয়। শুধু দোকানের বুড়ো মালিক, বুড়ো মালিক ঝুনঝুনওয়ালা —হ্যাঁ, সে আসে। ভালোবাসা দেখাতে আসে, ভালোমন্দ

খবর নিতে আসে। অকারণে গল্প করতে আসে। কেন আসে?

তবে—তবে কি—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই সে। নিশ্চয়ই সে টের পেয়েছিলো, নিশ্চয়ই সে বালিশটার ওজন জেনে ফেলেছিলো। আর সেই জন্যই তাকে এতো ভালোবাসার ঘটা, ছুটি দেওয়ার ঘটা। ঘর খালি পাবার জন্যই এই ব্যাকুলতা। দারুকেশ্বর ঠক ঠক করে দেয়ালে মাথা ঠুকলেন, থাবা থাবা হাতে বুক চাপড়ালেন, কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল করতে লাগলেন। এই ঘরখানা ঝুনঝুনওয়ালাই তাঁকে জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো, ঘরের তালাটা পর্যন্ত তার। হায়! হায়! একথা দারুকেশ্বরের কেন মনে হ'লো না যে, যাঁর তালা তার কাছে তার একাধিক চাবি থাকাও স্বাভাবিক। খরচ ক'রে কিনতে হ'লো না, অথচ ছু' ছু'টো দামি বিলিতি তালার মালিক হয়ে গেলেন, এই আনন্দেই তিনি ভুলে গেলেন সব।

কিন্তু তিনিও ছাড়বেন না সেই শূকরের সন্তানকে। যাবেন, এখুনি যাবেন, এখুনি দোকানে গিয়ে সক্কলের সামনে তাকে নাস্তানাবুদ করবেন, কাছা টেনে ধরবেন, গলায় গামছা দেবেন। টেনে জিব খসিয়ে দেবেন।

খাবেন বলে হালুয়াটা কেবলমাত্র ডেলা পাকিয়ে মুখের কাছে তুলেছিলেন, ফেলে দিলেন ছুঁড়ে, উঠে দাঁড়াবার বেগে কলাই-করা প্লেটটা কোল থেকে ছিট্‌কে পড়ে ঐখানে চলে গিয়ে কেঁপে কেঁপে নিশ্চল হ'লো, কানার কাছের এনামেল চটে গেল খানিকটা। নিজের প্রত্যেকটা জিনিস দারুকেশ্বরের প্রাণতুল্য।

সে এক পয়সার ছুঁচই হোক আর আট আনার কলাই-করা থালাই হোক। আজ সে সব মনে রইলো না, উদ্গত আবেগে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দরজা খুলে পাগলের মতো বেরিয়ে গেলেন তিনি। গেলেন দোকানে। দোকান বন্ধ। কেন বন্ধ? কিসের বন্ধ? সেখান থেকে আবার দৌড়োলেন তিনি মালিকের বাড়িতে। একটা গরু দাঁড়ালে এ-দেয়াল ও-দেয়াল জুড়ে যায়, এমন এক অন্ধ গলিতে ঝুনঝুনওয়ালার নিজের বাড়ি। ছ' পাশের অগভীরে ঢালু নর্দমায় নোংরা গন্ধ, ছ'পাশে দোকানে দোকানে ঠাসা। তৈজসপত্রের দোকান, সোনার দোকান, রূপোর দোকান, তামা কাঁসা পিতলের দোকান, ছাপা কাপড়ের দোকান—সার বেঁধে আছে সব। এক দৌড়ে সে গলি পার হ'লেন দারুকেশ্বর, তারপর নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। বিশাল তালা ঝুলছে। পাশের লোকেরা বললো, এক মাসের জন্য আপন দেশে গেছে মুলুকচাঁদ ঝুনঝুনওয়ালা, দেশে তার বুড়ি মা মারা গেছে। দরজার কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন দারুকেশ্বর।

৪

এ নিয়ে দারুকেশ্বর অনেক হাঙ্গামা করেছিলেন। পুলিশের বাড়ি দৌড়েছিলেন, উকিলের বাড়ি দৌড়েছিলেন, দোকানে গিয়ে হামলা করেছিলেন, প্রায় সাতদিন ধ'রে একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝলেন যে এর আর কোনো মীমাংসা হবার নেই। উপরন্তু প্রায় কপর্দকহীন হ'য়ে পড়ছেন দিন দিন। সুতরাং হতাশ হৃদয়ে বিছানা বালিশ গুটিয়ে, ভাঙা

ট্রাঙ্ক নিয়ে সেই আস্তানা ছাড়লেন তিনি। উত্তর দিক থেকে সোজা দক্ষিণ প্রান্তে এসে কালীঘাটের মা কালীকে সভক্তি প্রণাম ঠুকে সমস্ত রকম মনোবাসনা নির্গত করলেন। প্রথমেই মুলুকচাঁদকে রক্ত অতিসার রোগে তিনদিনের মধ্যে মেরে ফেলতে অনুরোধ জানালেন, তারপর কোনো দৈব উপায়ে সমস্ত টাকাটা যেন তিনি আবার ফিরে পান তার জন্য পাঁঠা মানসিক করলেন, শেষে বর্তমান কাজে যাতে সফল হন, যাতে এই কাজ থেকেই যা গেছে তা আবার চারগুণ ক'রে ফিরে পান এই প্রার্থনা জানিয়ে চার আনার ডালি দিলেন।

তাঁর সব প্রার্থনা মা কালী হয়তো শুনতে পেলেন না, কিন্তু শেষেরটা নিশ্চয়ই কানে গেল তাঁর। কন্‌ট্রাকটার ভদ্রলোক খুশি হ'লেন তাঁকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, এবং বেশ বেশী মাইনেতে সকল কাজের সহকারী ক'রে নিলেন। একাদিক্রমে চোদ্দ বছর যে ভদ্রলোক কন্‌ট্রাকটরের ডান হাত বাঁ হাত হ'য়ে কাজ করছিলেন কিছুদিন আগে মারা গেছেন তিনি, তারপর থেকেই কন্‌ট্রাকটরের নিজস্ব ব্যবসা চ্যাটার্জি কোম্পানির অত্যন্ত অসুবিধে চলছে। দারুকেশ্বর যে কর্মঠ হবেন, বিচক্ষণ হবেন এটা তাঁর সঙ্গে কথা বলা মাত্রই বুঝে নিয়েছিলেন কন্‌ট্রাকটর। বিশ্বস্ত হবেন কি না এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ জাগে নি মনে। এ বিষয়ে তিনি কিছু ভাবেন নি। তাঁর নিজের শরীর নিয়ে ভুগছিলেন একটু। স্নান খাওয়ার অনিয়ম আর সইছিলো না। বয়েস হয়েছে, ক্লান্তি বেড়েছে, আগের মতো হুড়োহুড়ি করবার শক্তি ক্ষয়ে এসেছে, মনে প্রাণে ঠিক এই রকম, এই দারুকেশ্বরের মতো ভরা

বয়সের যোয়ান অথচ পাকাপোক্ত ব্যবসায়ীবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মানুষকেই খুঁজছিলেন, তা ছাড়া তিনি চেনা জানা লোক, কুটুম্ব-স্থানীয়, সব দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য। খুশি না হবার কারণ ছিলো না।

হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর নিজের বাড়িতেই একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন তিনি, তাঁর স্ত্রী গাঁয়ের জামাই হিসেবে খাতির যত্নও করতে লাগলেন খুব। আর দারুকেশ্বরও তার প্রতিদান দিলেন বই কি। বিনীত হ'য়ে, নম্র হ'য়ে, বাধ্য হ'য়ে প্রতি পদক্ষেপে কনট্রাকটারের মন যুগিয়ে নিজেকে একেবারে অপরিহার্য ক'রে তুললেন কয়েক মাসের মধ্যে।

প্রথম প্রথম জিনিসপত্রের তদারক করা, কুলি খাটানো, ফিতে মেপে লরিভর্তি চুণ সুরকির ওজন দেখে নেওয়া, মালের অর্ডার দিতে যাওয়া এ কাজগুলোই করতেন। আস্তে আস্তে দরজা জানলার কাঠ কেনা, লোহা লক্কড়ের দোকানে দোকানে ঘোরা, দরকার মতো ঘুষ দিয়ে কালোবাজারী জিনিস ফুঁসলে বার ক'রে আনা এগুলোও তাঁর কাজের অন্তর্গত হ'লো। আর তারও পরে পেমেণ্ট করার ভারটাও চলে এলো হাতে। চোখ বুজে কনট্রাকটার সমস্ত কাজের গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন তাঁর কাঁধে। তারপর এমন একটা সময় এলো যখন প্রায় ছ' মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হ'লো কনট্রাকটারকে। দারুকেশ্বরকে সর্বতোভাবে অবলম্বন করা ছাড়া উপায় রইলো না কোনো।

সেই সময়ে এবং সেই সুযোগে টালিগঞ্জ ব্রীজের এপিঠে প্রায় গঙ্গার কাছে সরে এসে ছোট্ট একটি চুন-সুরকির দোকান খুললেন দারুকেশ্বর। মাল কেনার হাজার হাজার টাকা থেকে

কিছু টাকা বাকী রেখে ক্রেডিটে জিনিস নিয়ে সেই টাকায় নিজের নামে ঐ দোকানের সঙ্গেই কিস্তিবন্দীতে অতি সস্তায় কয়েক বিঘা জমি লীজ নিয়ে বসলেন। এটা করলেন অতি গোপনে, অতি নিঃশব্দে। কনট্রাকটার ভদ্রলোক কিছুই টের পেলেন না। তারপর শালাদের তাগাদায় টিঁকতে না পেরে, একখানা মাটির ঘর বানিয়ে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে। কিছুদিন বাদে তাঁর দোকানটি আরো একটু বড়ো হ'লো, তাঁদের নিজেদের চ্যাটার্জি কোম্পানীর মাল যুগিয়েই বেশ ভালোভাবে চলতে লাগলো। আরো পরে দরজা জানালার কাঠ, স্ক্রু বল্টু, লোহা সব কিছুরই আমদানী করতে লাগলেন তিনি।

দোকানের গোড়াপত্তন করতে কিন্তু এক পয়সাও মূলধন লাগলো না তাঁর। কোম্পানীর মণ মণ লরি ভর্ত্তি চুন-সুরকি প্রতিদিন তাঁর হাত দিয়ে মাপা হচ্ছে, অর্ডার যাচ্ছে তাঁর মারফৎ, তিনি ইচ্ছে করলে কা না পারেন। পঞ্চাশ হাজার মনের জায়গায় লরি যদি চল্লিশ হাজার মণ মাল দিয়ে দারুকেশ্বরকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার সই করিয়ে নিয়ে বাকী দশহাজার মণ টালিগঞ্জের দোকানে ফেলে দিয়ে আসে; কার কি বলবার থাকতে পারে? শুধু চুন-সুরকি বালিই নয়, বস্তা বস্তা সিমেন্টও এ ভাবেই বন্টন হ'তে লাগলো। লিণ্টেলের টন টন লোহা বিশাল বিশাল সেগুন কাঠের গুঁড়ি—তা-ও বাদ গেলো না।

চ্যাটার্জি কোম্পানীর কনট্রাকটার চ্যাটার্জি যতোদিন ভুগলেন, ততোদিনে এই সব গুছিয়ে নিলেন দারুকেশ্বর। আর তারপর সেই ভদ্রলোক সুস্থ হ'য়ে কাজে আসা মাত্রই হঠাৎ

একটা সাংঘাতিক চুরি হ'য়ে গেল গুদোমে। হাঁউ মাউ ক'রে কেঁদে কেটে হাট বাধালেন দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হ'য়ে কন্‌ট্রাকটার বললেন, 'কী হয়েছে। কী ব্যাপার!'

আর কী ব্যাপার! বিশাল এক ফ্ল্যাট উঠছে আশুতোষ মুখার্জি রোডে, প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মাল মজুত করা ছিলো সেখানে। গভীর রাত্রে দুর্বৃত্তরা এসে দারোয়ানের হাত পা বেঁধে লরি ভর্তি ক'রে প্রায় আদ্ধেক মাল সরিয়ে ফেলেছে। সরকারী অনুমতিপত্র নিয়ে কন্ট্রোল দরে লোহা কেনা হ'য়েছিলো সব গেছে। এখন যদি কালোবাজারে বেশী দাম দিয়ে আবার সেই লোহা কিনে আনতে হয় তা হ'লে চ্যাটার্জি কোম্পানীর আর ফেল পড়তে বাকী থাকবে না কিছু।

শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে হার্টফেল করবার দশা হ'লো চ্যাটার্জির। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে পিঠে, তিনি এলিয়ে পড়লেন বিছানায়।

ইদানীং এমনিতেই তিনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন কাজ-কর্ম ব্যাপারে। ব্যবসাটা হঠাৎ তাঁকে এমন একটা জায়গায় এনে পৌঁছে দিয়েছিলো যেখান থেকে হিসাব মিলাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কতো স্কোয়ার ফুট জমি ঢাকতে কতোখানি ইঁট চুন-সুরকি বালি আর সিমেণ্টের দরকার হয় এ হিসেব এতোদিন তাঁর নখদর্পনে ছিলো। হঠাৎ মনে হচ্ছিলো সেই মাপ যেন তাঁর কোথাও মিলছে না। অনেকদিন এ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন দারুকেশ্বরের সঙ্গে, শুয়ে শুয়ে অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিয়েছেন এর বেশী লাগতেই পারে না, তবে কেন মালে কম পড়ে। হাঁ ক'রে সরল চোখে তাকিয়ে থেকেছেন দারুকেশ্বর,

বোকার মতো প্রশ্ন করেছেন, 'তবে কি স্যার আমার কোনো অনভিজ্ঞতার দরুণই এরকম হচ্ছে ?'

'তা কেমন ক'রে হবে—' বিশ্বস্ত দৃষ্টিতে দারুকেশ্বরের মুখের উপর চোখ রেখেছেন কন্‌ট্রাকটার, বলেছেন, 'মালটা যখন ফেলে তখন তো তুমি নিজে দাঁড়িয়েই মেপে নাও। আর মাপতে তো তুমি নিশ্চয়ই ভালো ক'রে জেনে নিয়েছ।'

'তা নিয়েছি।'

'তবে ?'

'সেই তো ভাবি।' তারপর সত্যিই ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে লাফিয়ে উঠেছেন দারুকেশ্বর—'বুঝেছি, বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ ?' আশান্বিত হ'য়েছেন কন্‌ট্রাকটার। দারুকেশ্বর বলেছেন, 'আমার মনে হয় কোনো অবিশ্বাসী লোকের জন্যই এই অনিষ্টটা হচ্ছে।'

'কার জন্য হচ্ছে ব'লে তোমার ধারণা ?'

দারুকেশ্বর চোখ নিচু করেছেন—'থাক, স্যার সে সব ব'লে আর ইয়ে করবো না।'

চোখ কুঁচকে কন্‌ট্রাকটার বলেছেন, 'ছাখো দারুকেশ্বর, আমার এই কোম্পানী আজকের নয়। আমার বয়েস হ'য়েছে পঞ্চাশ, কাজ করছি আমি তিরিশ বছর ধ'রে। নিতান্ত দরিদ্র ছিলাম, অতি কষ্টে আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো লেখাপড়ার দিকেই থাকি। কিন্তু আই.এ. র পরে আর বি.এ. তে ভর্তি হবার সাধ্য হ'লো না। মামাবাড়িতে থাকতুম, মামা এনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। ঠিক তোমার মতো করেই ঢুকেছিলাম। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। হাতেকলমে সব কাজ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমাকে।

কাঁদলেন, তারপর রাত হ'লে, একলা হয়ে আঁতিপাঁতি ক'রে ট্রাঙ্ক বাক্স ঘাঁটতে বসলেন। ছাই—কিচ্ছু নেই। কুলুঙ্গিটাই হাতড়াতে লাগলেন একশোবার। নেই—কিচ্ছু নেই। শেষে একটা শাবল দিয়ে আন্দাজ ক'রে ক'রে বাড়ির আনাচে-কানাচে উঠোনে, খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত ক'রে ফেললেন। পরিশ্রমে ঘাম ছুটলো কপালের, যোয়ান শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে এলো, তবু তিনি ছাড়লেন না। ভোর রাত্রের দিকে, যখন প্রায় ফর্সা হ'য়ে এলো তখন এসে শুলেন। পরের দিন ঘুম ভাঙলো বেলায়, আবার খানিকটা লোকদেখানো কান্না কেঁদে, ঘরের সব জিনিস উঠোনে এনে টাল করলেন। তিনটে তক্তপোষ, একটা খাট, একটা বেঞ্চি, চারটে জলচৌকি, আরো সব কি কি আসবাব-পত্র। নীলেম ডেকে বিক্রী করলেন ত্ব'দিন ধ'রে। তারপর বাসন-কোসন, পূজোর কোষাকুষি, সতরঞ্চি, মাত্বর, পাটি, বালিশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স—সব, সব বিক্রী করলেন একে একে। এই সমস্ত করতে পুরো দশদিন লাগলো তাঁর। হাতের মুঠো মন্দ ভরলো না তাতে। এবার শ্রাদ্ধ ক'রে শূন্যগহ্বর বসতবাটিতে শিকল তুলে ফিরে এলেন কলকাতা। কলকাতা এসেই মাটির বাড়িতে ইঁটের গাঁথুনি দিলেন, টিনের ছাদ খুলে রেখে এ্যাস্‌বেস্‌টাস লাগালেন। তাঁর নিরানব্বুই বছরের লীজ নেওয়া সাড়ে চার বিঘে জমির মধ্যে টিনের সেডে দোকানঘর আর ঐ ছোট্ট বাড়িখানা ধূ ধূ করতে লাগলো।

সেই ধূ ধূ জমির দিকে তাকিয়েই আর একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। পরবর্তী জীবনে সেই বুদ্ধিতেই তিনি লোহার কারখানা খুলেছিলেন, সংলগ্ন আরো ছ' বিঘা জমি নিয়ে বস্তি বানিয়ে-ছিলেন।

কিন্তু সে সব আজকের কথা নয়, অতীতের স্মৃতি মাত্র। যে স্মৃতি একমাত্র দারুকেশ্বরের হৃদয়েই একটুকরো ঝাপসা ছবি হ'য়ে আছে। অনেক কিছু করতে করতে হঠাৎ যে স্মৃতি অবচেতনের তিমির থেকে সব ভেদ ক'রে উঠে আসে মাঝে মাঝে। একটি পঁচিশ বছরের যুবকের ওপর দিয়ে তারপর আরো কতো দিন ক্ষণ মাস বছর গড়িয়ে গড়িয়ে কতো ঋতুর ছাপ রেখে গেল শরীরে মনে! পথ চলতে চলতে কতো ফুল মাড়ালেন, কতো কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হ'লেন। ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চ্যাটার্জি কোম্পানীর চ্যাটার্জি কনট্রাকটারের মতো আরো কতো মানুষকে ডিঙিয়ে ভাঙিয়ে উঠে এলেন ওপরতলার সিঁড়িতে! দরকার মতো কখনো কারো পা ধরলেন, কারোকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন, কতোবার বন্ধুতা করলেন, কতোবার তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে মিশিয়ে দিলেন রাস্তার ধুলোয়! কিছু ভুললেন, কিছু মনে রাখলেন, কিছু হাতে রাখলেন, কিছু ফেলে দিলেন! তারপর কালস্রোতে কোথায় ভেসে গেল সেই সব দিন, সেই সব কথা, সেই সব মানুষ। এমনি ক'রেই একদিন ভাগ্যের অনেক উঁচু চূড়োয় উঠে পেঁৗছুলেন এসে একাত্তর বছরের সিংহ দরজায়। ধনে সম্পদে কর্তৃত্বে যেখানে এসে এখন থর থর করছেন তিনি।

৬

স্ত্রী মারা গেছেন বহুকাল আগে। সেই টালিগঞ্জের গঙ্গার ধারের জঙ্গল থেকে, বালিগঞ্জের এই জঙ্গলে এসে মাত্র কয়েক বছর ছিলেন। মেয়ের পরে পর পর আরো পাঁচটি সন্তানের জননী হ'য়েই হাঁফ ধরেছিলো তাঁর বুকে। মাঝখানের দু'টিকে

মৃত্যুর কাছে সঁপে দিয়ে আরো ভেঙে গেলেন। প্রথম সন্তান মেয়ের পরে তুই ছেলে, তারপরে আর এক মেয়ে, তারপর আবার তুই ছেলে। কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিয়ে যখন সূতিকাগৃহে দারুণ রক্তহীনতায় মূর্ছার মতো পড়েছিলেন, সেই সময়ে সত্যো-জাত শিশুর উপরের আড়াই বছরের ছেলেটি এবং সাড়ে তিন বছরের মেয়েটি, তু'জনেই অযত্নে জ্বরে পড়লো। বুকে ঠাণ্ডা বসে সব মিলিয়ে হয়তো দিন পনেরো ভুগেছিলো তারা। তারপর অচিকিৎসায় মারা গেল। দারুকেশ্বর দাহ ক'রে এসে একদিন ঝিমিয়ে রইলেন, তারপরেই আবার কাজে ডুবে গেলেন। কিন্তু দারুকেশ্বরের স্ত্রীর ফোঁপানি থামতে সময় লাগলো। এ নিয়ে দারুকেশ্বর অনেক ধমক ধামকও করলেন। সেই ধমকে আস্তে আস্তে চোখের জল শুকোলো বটে কিন্তু বিছানার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মালো।

দারুকেশ্বর তাতেও রাগ করলেন। মেয়েমানুষের একমাত্র যোগ্যতাই তো তার শরীর, তার স্বাস্থ্য। তাই যদি গেলো তো রইলোটা কী?

এ কথা শুনে আবার শুকনো চোখে জল দাঁড়ায় দারুকেশ্বরের স্ত্রীর। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আবার উঠে দাঁড়ান তিনি, আবার রান্না করেন, বাসন মাজেন, ঘর ঝাড়েন, ছেলে রাখেন ধুঁকতে ধুঁকতেও সধবা স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ঐ ধারণ পর্যন্তই, শেষ অবধি আর পৌঁছুতে পারলেন না। সাত মাসের মাথায় একটি কড়ে আঙুলের মতো মৃত শিশু প্রসব করেই রক্তক্ষরণের আধিক্যে চোখ বুজলেন। তাঁর আর সবকিছুর মতো মৃত্যুটাও খুব নিঃশব্দে হ'লো। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মারা গেলেন।

খবর পেয়ে কাজ থেকে ছুটে এলেন দারুকেশ্বর, একপাল্লা শিশুসন্তানদের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখলেন দুই চোখে। স্ত্রীর জন্য কষ্টও পেলেন একটু। শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলাটি যে মানুষ হিসেবে নিতান্ত মন্দ ছিলেন না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হ'লেন। এমন কি এ কথা ভেবে অন্তরে অন্তরে বেশ একটু অনুতপ্ত হ'লেন যে কাজকর্মের জন্য অতটা চাপ না দিলে, একটা ঠিকে ঝি রেখে দিলে হয়তো এতো তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে যেতো না তাঁর স্ত্রী। তা ছাড়া কিছু ওষুধপত্রও খাওয়ানো উচিত ছিলো, ডাক্তার দেখানো উচিত ছিলো। কিন্তু যা হ'য়েছে তা হ'য়েছেই, আর তো তার পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়। সুতরাং বিলাপ ক'রে আর লাভ কী। আর ওসব বিলাপের সময়ই বা তাঁর কোথায়? স্বভাবও নয়। বরং এখন সংসারটা চলবে কী করে, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া, এতোগুলো শিশুর রক্ষণা-বেক্ষণ করা—এ সবের কী ব্যবস্থা হবে সে কথা চিন্তা করাই বেশী জরুরী।

প্রতিবেশীরা গায়ে পড়ে দেখাশুনো করতে এসেছিলো, মুখের পেশীতে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে তাদের তাড়ালেন দারুকেশ্বর। তারপর খুঁজেপেতে একজন শক্তসমর্থ ঝি নিয়ে এলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার ঠিক হ'য়ে গেল সব। শিশুদের মনের কথা শিশুরাই জানে, কিন্তু দারুকেশ্বরের আর কোনো অসুবিধে রইলো না। বরং বিয়ে করা বৌয়ের চেয়ে মাইনে করা ঝি দিয়েই তিনি বেশী কাজ পেতে লাগলেন। সাংসারিক কাজ তো বটেই, কর্তার মনোরঞ্জনের ভূমিকাতেও স্বাস্থ্যবতী ঝিটির পটুতার অভাব দেখা গেলো না কোনো। আর সেই পটুতার

অবশ্যম্ভাবী ফল যা হওয়া উচিত, কয়েক মাসের মধ্যেই তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো। একদিন দারুকেশ্বর তাকে নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন আর এক ঝি নিয়ে। দেখা গেল এই মেয়েটিরও স্বাস্থ্য বেশ ভালো, বয়েস আরো অল্প।

প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচুর জটলা হ'লো তাই নিয়ে। কিন্তু দারুকেশ্বর আপন কর্মে অটল, অচল। এ-সব নিন্দা-চর্চা তিনি গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর ঘরে গৃহিণী নেই, স্বাস্থ্যবতী অল্পবয়সী ঝি না হ'লে তাঁর চলবে কেন?

অবিশ্যি বিয়ে করলেই সব ঝামেলা চুকতে পারতো। কিন্তু ও সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে আর রাজি হ'লেন না তিনি। পরিবার হ'লেই তার প্যাখনা হবে অনেক। এই চাই ওই চাই, আজ মাথাধরা কাল শরীর ব্যথা—তার উপর ছেলেপুলে হওয়া তো লেগেই থাকবে বছর ভ'রে। বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান তখন কে উৎপাটন করবে? আর এক স্ত্রী ভালোমানুষ ছিলো বলে, অন্য স্ত্রীটি যে দুরন্ত দজ্জাল হবে না তার কি অঙ্গীকার আছে কোনো? তবে?

বেশ ভালোই চলছিলো সব। হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন, বড়ো মেয়েটি যেন বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। সাংসারটাকে যেন কেমন সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। বয়সটা হিসেব করলেন মনে মনে। বারো পূর্ণ হ'য়ে গেছে পাঁচমাস আগে। যত্তো ঝামেলা। মনে মনে গাল দিলেন তিনি, অনুভব করলেন স্বাস্থ্যবতী আর অল্পবয়সী ঝি রাখা আর চলবে না। কারণে অকারণে সেই ঝিয়েদের ফষ্টি নষ্টি চোখের জল, কারণে অকারণে চেঁচিয়ে উঠে ভয় দেখানো, আর সেই দেখানো ভয়ে

দারুকেশ্বরের কাতর হ'য়ে ওঠা, সব যেন ওই বারো পূর্ণ তেরো বছরের মেয়েটা কেমন মনোযোগ দিয়ে দেখে, শোনে। ঝিগুলো যখন বাসনমাজা খসখসে হাত পেতে রীতিমতো অধিকারের দাবি নিয়ে মোটা টাকা আদায় করতে আসে, ঐ মেয়েটা যেখানেই থাকুক, ঠিক টের পেয়ে যাবে। ঝিগুলোকে ঠাণ্ডা করবার জন্য দারুকেশ্বরের গোপন ধমক, গোপন শাসন, গোপন ভালোবাসা আর গোপন ক্ষতিপূরণ সব যেন উদ্ঘাটন করে ফেলতে চাইবে ঐ পাকা মেয়েটা।

মেয়ের ওপর তিনি খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠলেন। মেয়েকে তাঁর সুখের কাঁটা বলে মনে হ'তে লাগলো। স্ত্রী আদর ক'রে লক্ষ্মীমণি নাম রেখেছিলেন, সেই নামটা তৎক্ষণাৎ উল্টে দিতে ইচ্ছে করলো। তখন তিনি উঠে পড়ে লাগলেন তাকে বিদায় করতে। ঘটক লাগিয়ে সম্বন্ধ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু মেয়েটি আসলে লক্ষ্মীই ছিলো। ঝি উঠিয়ে দিয়ে বাবা যখন তাকে শাস্তি দেবার জন্য সকল কাজের ভার চাপিয়ে দিলেন তার ওপর, নিঃশব্দে করতে লাগলো সব। না ক'রেই বা উপায় কী? শব্দ করবে, আপত্তি করবে, পারিনা বলে বসে পড়বে, এমন সাহসই কি আছে নাকি তার। বাপকে সে যমের মতো ভয় করে। ঠাণ্ডা শীতল মাকে মনে পড়ে তখন, চোখ ভ'রে জল আসে। অম্লানবদনে সংসারের সমস্ত কাজ করতে করতে, কখনো সোজা দক্ষিণে—মার মতো ক'রেই টলটলে লেকের জলের দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়তো মার মতোই ডুবে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ইচ্ছে আর সামর্থ্য কি এক? ভাইয়েরা সবাই তার ছোটো, সবাই ঐ একরত্তি দিদির স্নেহের ছায়ার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছে, তারা তাকে কাঁদতেও দেয় না

প্রাণভরে। বিশেষ ক'রে সবচেয়ে ছোট ভাইটি—তার তো সে-ই মা।

৭

দারুকেশ্বরের প্রতি এই অমানুষিক ভয় অবিশ্যি শুধু লক্ষ্মীমণিরই ছিলো না, ছেলে তিনটিও কাঁটা হ'য়ে থাকতো। দারুকেশ্বর ভাবতেন কাটলেট যেমন যতো বেশী থেঁতো করা যায় ততো বেশী সুস্বাদু হয়, শিশুরাও তেমনি। দোষ করুক চাই না করুক, শাসনের দণ্ড সর্বদাই উদ্যত রাখতে হবে। আর যেহেতু বাপ ছাড়া সংসারে তারা অন্য কোনো লোকের আশ্রয় পেতো না, সে জন্যে শাসনটাও নিরবচ্ছিন্ন হবার বাধা ছিলো না কোনো। যদি তাদের মা জীবিত থাকতেন, নিশ্চয়ই দারুকেশ্বর এই রকম মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাঁর ওপর এমন নির্বিচার আনুগত্যে অভ্যস্ত করাতে পারতেন না। মায়ের স্নেহ বড়ো ভীষণ জিনিস। নিশ্চয়ই সন্তানের প্রতি দারুকেশ্বরের একাধিপত্যে বাদ সাধতেন। নিষেধ শাসনে বাধা দিতেন। যতো ভীরু স্ত্রীলোকই হোক, এই একটি জায়গায় তারা মরীয়া। নিজের উপর স্বামীর সমস্ত অত্যাচার তারা হয়তো সারাজীবন মুখ বুজে সহ্য করবে কিন্তু সন্তানের বেলায় অন্যমূর্তি। সেখানে সে শাবকরক্ষক বাঘিনীর সমগোত্র।

ছেলেদের ভয়ভীতি বাধ্যতা দেখতে দেখতে একথাটা প্রায়ই মনে হ'তো দারুকেশ্বরের। সেই সঙ্গে নিজের মাকেও মনে পড়তো। কেদারেশ্বরের মতো ঐরকম রাশভারি দুর্দান্ত বাপকেও তিনি অমন অনায়াসে (খুব কি অনায়াসে ?) পরিত্যাগ ক'রে চলে আসতে পারলেন, তার কারণটা কী ? একদিকে পিতার

নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে মায়ের প্রশ্রয়, প্রতিবাদ। কেদারেশ্বরের শাসনের লাগাম ঢিলে হ'য়ে গিয়েছিলো, এই দুইয়ের সংমিশ্রনে। আর সেই ছিদ্র দিয়েই দারুকেশ্বর দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর বাবা যা করছেন যা বলছেন সেটাই রীতি নয়, নীতি নয়, একমাত্র নয়। এর প্রতিবাদ আছে, প্রতিরোধ আছে।

দারুকেশ্বর এদিক থেকে ভাগ্যবান। সত্যি ভাগ্যবান। স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যতো কষ্টই হোক বা যতো অসুবিধেই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ফলটা তার ভালোই হ'য়েছিলো। ছেলেদের মানুষ করতে তাঁর আর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হয়নি। শক্ত হাতে রাশ টেনে টেনে তিনি তাদের শায়েস্তা করেছেন, শুধু একটি জায়গায় কী জানি কেমন ক'রে হঠাৎ একফোঁটা জল ঢুকে গেছে, তাঁর শুকনো হৃদয়ের মরুভূমিতে সেই একফোঁটা জল এক টুকরো ঘাসের জমি তৈরী করে ফেলেছে। কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রতি তিনি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই একটু দুর্বল। মাতৃবিয়োগের পরে এই শিশু-শরীর রাতের পর রাত তাঁর বুকের তলার আশ্রয়েই ঘুমিয়ে থেকেছে, তাঁর উদাসীনতাকে উপেক্ষা ক'রে, তাঁকেই ক্রমাগত চেয়েছে, কাজ থেকে দেরি ক'রে ফিরলে হাপুস নয়নে কেঁদেছে, ভয়ডর ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। এই ছেলেকে ছাড়াতে পারেন নি, নড়াতে পারেন নি, দূরে ঠেলে রেখে নির্লিপ্ত হ'তে পারেননি। অবিশ্যি তাতে ক্ষতি হয়নি কোনো, শাসনের ভাগে কিছু কম পড়লেও এই ছেলে তাঁর স্বভাবতই শান্ত, বাধ্য, অনুগত।

কিন্তু এ-ও সেই অতীতেরই গল্প, যে অতীতকে তিনি অনেক কাল আগে ছাড়িয়ে এসেছেন, পিছন ফিরে তাকালে যে অতীত

এখন ধূ ধূ প্রান্তর মাত্র। সে অতীতে তাঁর স্বাস্থ্য ছিলো অসুরের মতো, একদিন এককোঁটা মাথাও যাঁর ধরেনি। এখন, বুড়ো হ'তে হ'তে মাঝে মাঝেই দেহ বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাঁর সঙ্গে। আজ ঘুম হয় না, কাল খাবার হজম হয় না, পরশু দাঁতের গোড়া কন্‌কন্‌ করে, এ তো লেগেই আছে, তার উপর আসল ব্যামো হচ্ছে তাঁর ব্লাডপ্রেসার। এটা নতুন। প্রেসার বাড়লে তিনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়েন, তখন ছেলেরা যে যেখানে থাকে ছুটে আসে কাছে, হন্তদন্ত হ'য়ে ডাক্তার ডেকে আনে, সেবার আধিক্যে এ ওকে হার মানায়, ধাক্কাধাক্কি করে। হয়তো সেই একাগ্র যত্নেই দারুকেশ্বর আবার চোখ মেলে তাকান পৃথিবীর দিকে, কয়েকদিন শুয়ে থেকেই উঠে বসেন। আর একবার ভালো হয়ে উঠলেই কোনো ভাবনা থাকে না। ঈশ্বর তাঁর শরীরে খুব দামী ইঞ্জিন লাগিয়ে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন, সামান্য ওষুধ ইঞ্জেক্‌সনের তেল খেযেই আবার তা পুরোদমে চলতে থাকে। আবার তিনি সুস্থ সবল হ'য়ে কাজে লেগে যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দারুকেশ্বরবাবু যখন প্রথম এ পাড়ায় এসেছিলেন, বাড়িটি একতলা ছিলো। চারপাশে ফাঁকা জমি পড়ে থাকায় বেশ হাত পা ছড়ানো মনে হ'তো। এখন সেই সব জমি ভরাট হ'য়ে মস্ত মস্ত প্রাসাদ উঠে গেছে। পৃথিবীর লোক এসে ভিড় করেছে এই অখ্যাত কেয়াতলা নামধারী পাড়াটিতে। তাঁর বাড়িওলাও তাঁর একতলার উপরে দোতোলা তেতোলা বানিয়ে ভাড়াটে বসিয়েছেন, কিন্তু তাদের কাছ থেকে যা ভাড়া নিচ্ছেন, দারুকেশ্বরবাবু দিচ্ছেন তার তিনভাগের একভাগ। বাড়িওলা ক্রুদ্ধ হ'য়ে অনেকবার তাঁকে উঠোবার চেষ্টা করেছেন, পারেন নি, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করেছেন। শুধু একবার দারুকেশ্বরবাবু দয়া-পরবশ হ'য়ে পঁয়তিরিশ টাকা ভাড়ার বদলে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে চল্লিশ টাকা ক'রে দিয়েছিলেন। ব্যস্‌ সেই শেষ। তা-ও আজ পনেরো বছর আগের কথা। দোতোলার ভাড়াটেরা তিনখানা ঘরের জন্য তিনশো টাকা দেয়, তেতোলার ভাড়াটেরা চারতোলার উপরের একটি চিল কুঠি মিলিয়ে সাড়ে তিনখানা ঘরের জন্য সাড়ে তিনশো দেয়, আর দারুকেশ্বর দেন চল্লিশ।

তিনখানা ঘরের একখানা বেশ বড়ো সড়ো, আলো বলতে হাওয়া বলতে চারপাশের বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে যা একটু আসে, ঐ ঘরেই আসে। অন্য দু'খানা তার চেয়ে ছোটো। কিন্তু পূবদক্ষিণ কোণ জুড়ে বেশ চওড়া চৌকো বারান্দা আছে একটি।

ছ’ সিঁড়ি নেমে ছোট্ট একটু উঠোন, উঠোনেই কল চৌবাচ্চা রান্না-ঘর। রান্নাঘরের পাশে খুপরিমতো একটুখানি একটা বাথরুম।

এর মধ্যে দারুকেশ্বরের বড়ো ছেলে, মেজ ছেলে, ছোট ছেলে তাদের তিন স্ত্রী নিয়ে বসবাস করে। বড়ো ছেলের চারটি শিশু, মেজ জনের তিনটি—আর ছোটো জনের একটি। সব মিলিয়ে চোদ্দোজন। আর দারুকেশ্বর নিজে। অর্থাৎ পনেরোজন। তাছাড়া আরো আছে, ছ’জন চাকর আছে, একজন টাইপিস্ট আছে, একজন সরকার আছে। তা হ’লে মোট সংখ্যা দাঁড়ালো উনিশ। তবে সরকার আর টাইপিস্ট ছোকরাটি খায় কিন্তু শোয় না। একটু দূরে একটি গ্যারেজ ঘরে তাঁদের গুদোম আছে মালপত্রের, কোনো রকমে সেই সবের ফাঁকে একটু জায়গা ক’রে নিয়ে এক কোণে একটি মলিন শয্যায় শুয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে থাকে।

দিনের বেলা যতক্ষণ বুড়োর কাছে কাজকর্ম থাকে, করে, যা ফরমাস থাকে খাটে, বাকী সময় ফুটপাতে, পার্কে, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি এই ক’রে ক’রে সময় কাটায়। এই কর্মচারী ছ’টিকে দারুকেশ্বর নিজের দেশ থেকে আনিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু তেমন লেখাপড়া শেখেনি। না পারে আপিসের কাজ করতে, না পারে লোকের বাড়ির চাকর হ’তে। অথচ প্রত্যেকের ঘাড়ের উপরেই একটি ক’রে সংসার আছে। মা-বোনের সংসারই হোক বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সংসারই হোক। রোজ-গার না করলেই অনাহার। তাই সুযোগ বুঝে দয়ালু দারুকেশ্বর নিয়ে এসে এই চাকরী দিয়েছেন। চার বেলা খেতে দেন, আবার হাতখরচাও দেন পনেরো টাকা ক’রে। কম কথা নয়। অবিশ্যি চাকর ছ’জনকে খাওয়া-পরা বাদেও একজনকে পঁয়ত্রিশ

আর একজনকে পঁচিশ টাকা ক'রে দিতে হয়, নৈলে তারা থাকে না। এক বাড়িই তো নয়, তাদের দশ বাড়ি আছে। গতর খাটালে পয়সার অভাব নেই।

চাকর ছ'জনকে যে তিনি সাধ ক'রে এতো মাইনে দিয়ে রেখেছেন তা নয়। এখন তাঁর নিজের অবিশ্রান্ত একটি লোক না হলে চলে না। শরীরের তো এই অবস্থা, প্রায়ই অশক্ত হয়ে পড়ে। রাত্রিবেলা কেউ ঘরে না শুলে মৃত্যুভয় হয়। তাই সারাদিন সারাক্ষণ একটি লোককে তিনি চোখের সামনে দেখতে চান, খাটাতে চান, অনর্গল কথা বলতে চান এবং তার মারফৎ সংসারের উনকোটি চৌষট্টি খবরটুকু সংগ্রহ করতে চান। সেই লোকটি তাঁকে স্নানের ঘরে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। রাত্রি-বেলা বাথরুমে যেতে না পারলে ঘরের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করে দেয়। আরো আছে, বিছানা ঠিক ক'রে দেওয়া আছে, হাতের কাছে সব জিনিস এনে দেওয়া আছে, পঞ্চাশবার দোকানে যাওয়া আছে। বুড়ো বয়সে লোভ হয়েছে খুব। নাতি-নাতনীতে ঘর ঠাসা, লুকিয়ে লুকিয়ে ঠোঙাভরা জিলিপি এনে খেতে হয়, তেলে ভাজা আনতে হয়। অতএব বেশি মাইনে দিতে হলেও এই লোকটাকে রাখতেই হয় তাঁর। আর অন্যটাকেও না রেখে পারা যায় না। এতোজন লোকের রান্না-বান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, বড়ো কম নয়। বৌরা পেরে ওঠে না। চায়ও না। তাছাড়া বড়ো বৌ, মেজ বৌ বেশীর ভাগ সময়টাতেই পালা ক'রে ক'রে বাপের বাড়ি সন্তান হ'তে চলে যায়। আসে একেবারে পাঁচ-সাত মাস কাটিয়ে। বুড়ো দারুকেশ্বর হিসেব ক'রে দেখেছেন ছানাপোনা নিয়ে যে-ক'দিন তারা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে তাতে বাচ্চাদের দুধ থেকে

মায়েদের প্রসবের খরচ, খাওয়া দাওয়া সব শুদ্ধ যে খরচটা সংসার থেকে বাদ যায়, তাতে একটা চাকর রাখা চলতে পারে।

২

বুড়ো দারুকেশ্বরের কলকাতা সহরে বিত্ত আছে কিছু। ভবানীপুরে বড়ো রাস্তার ধারে বাড়ি আছে তিনখানা, একখানা বৌবাজারে। দু'টি বস্তি আছে, একটি খিদিরপুরে, একটি টালিগঞ্জের সেই চুন সুরকির দোকানের তিন বিঘা জমিতে। তার আয় বড়ো মন্দ নয়। ফাঁপানো কারবার আছে। লোহার কারখানা। সেখানে নানারকম পাইপ তৈরা হয়, দেশে বিদেশে চালান যায়। ছেলেরা তিনজন সেই কারবারেই খাটে। বড়ো জন ওভারসিয়ারি পাশ করে ঢুকেছে, মেজ জন ইঞ্জিনিয়ারিং আর ছোটজন ওকালতি। বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই ছেলেদের এইভাবে শিক্ষিত করেছেন দারুকেশ্বর। আর তাতে ফলও ফলও পাচ্ছেন আশাতিরিক্ত। আগে ব্যবসাটা এতো বড়ো ছিল না, ছেলেরা সব পাশ টাস ক'রে কাজে লাগবার পরই এমন হয়েছে। লক্ষ্মী এসে সোহাগ ভ'রে ধরা দিয়েছেন হাতের মুঠোয়। অক্লেশে টাকা জমেছে ব্যাঙ্কে। তা জমুক। টাকা জিনিসটার জন্মই জমবার জন্য। ফাই ফুটুনি ক'রে যদি খরচই করবেন, তবে আর এত কষ্ট ক'রে রোজগার করা কেন?

পিতার সঙ্গে এই বিষয়ে ছেলেরাও সম্পূর্ণ একমত। তারাও জীবনে কোনোদিন কোনোরকম বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয়নি,

দারুকেশ্বরের নিয়মকেই জীবনযাপনের অভ্রান্ত আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে।

তারা দেখতে কেউ ভালো নয়। গায়ের রং পেয়েছে মায়ের মতো, চেহারা পেয়েছে দারুকেশ্বরের। কালো রংয়ের মুখের উপর ছোটো চোখ আর থ্যাবড়া নাক। দেহ স্থূল। তার উপরে তাদের সাজসজ্জা সেই দেহেরই অনুরূপ। হেঁটো ধুতির তলায় মস্ত মোটা লোমশ পায়ের গোছ প্রায় হাঁটু পর্যন্ত খোলা থাকে। ঊর্দ্ধাঙ্গের খাটো ফতুয়া আর মাথার কদম ছাঁট চুলে তাদের বিশেষ কোনো জন্তুর মতো দেখায়। কিন্তু এ নিয়ে কখনো তারা মাথা ঘামায় না, আয়না দিয়ে দেখে আঁৎকে ওঠে না। সারাদিন ভূতের মতো খাটে আর পিতার আদেশে ওঠে বসে। তাতেই তারা অভ্যস্ত। তাদের নিজস্ব কোনো যুক্তি নেই, বুদ্ধি নেই, ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তি নেই।

রক্ষণশীল পিতার পুত্র তারা, দারুকেশ্বর তাদের তিন ভাইকে যথেষ্ট কড়া শাসনে মানুষ করেছেন। অবিশ্রান্ত দেখাশুনো করার জন্য তাঁর নিজের চেয়েও একজন কঠোর শিক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছেন বারোমাস। ছেলেবেলাকার সেই শাসন বড়ো হ'য়েও তারা ভোলেনি, সেই অভ্যাস বড়ো হ'য়েও তাদের ঘোচেনি। এখনো এই বয়সেও পিতার নির্বিচার আনুগত্যেই তারা অভ্যস্ত। তারা কেউ (প্রকাশ্যে) সিগারেট খায় না, সিনেমা দেখে না, মেয়েদের দিকে তাকায় না। মেয়েরাও অবিশ্যি তাকায় না। না তাকাক। বিয়ের বাজারে তাই বলে তাদের দর এক কানাকড়িও কম হয়নি। বুড়ো দারুকেশ্বর সাংঘাতিক উঁচু দামেই ছেড়েছেন ছেলেদের। বড়ো ছেলেকে

দিয়ে পেয়েছেন দশহাজার। দানসামগ্রী গয়না-গাটি এসব কিছু অবশ্য নেন নি, সবটাই নগদে ধরে নিয়েছিলেন কারণ জিনিসপত্র আসা মানেই বাড়িতে জঞ্জাল বাড়া, আরামের অভ্যাস হওয়া এবং সে সবের ভোগদখলের স্বত্বও ছেলে-বৌয়ের হাতে চলে যাওয়া। কিন্তু নগদ টাকার ভাগ নেই, সেটা সম্পূর্ণ-ভাবেই দারুকেশ্বরের, যে দারুকেশ্বর ছেলেদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছেন। এ টাকা ছেলেদের কাছ থেকে সেই ঋণেরই সামান্য পরিশোধ মাত্র।

মেজ ছেলেকে দিয়ে তার চেয়ে ও বেশী পেয়েছিলেন। অবিশ্যি সঙ্গত কারণেই পেয়েছিলেন। চেহারা আর চলন বলন দিয়ে আর কে কবে বাঙালী মেয়ের পাত্র নির্বাচন করেছে। হাতে কলমে তাদের যোগ্যতা তো কম নয়? বিয়ের দরবারে তারা বরং একটু বেশীই উপযুক্ত। শুধু যে তারা নিজেরাই উপযুক্ত তা-ই নয় কলকাতা সহরে তাদের না আছে কী? বাড়ি তিনটির ভাড়াই তো পাচ্ছে মাসে তিনশো ক'রে, তার উপরে বস্তি।

সহরের বাবুরা অবিশ্যি মেয়ে নিয়ে এগুলোনা কেউ। কানে শুনে এসে চোখে দেখে ফিরে গেল সব। তা যাক। সহুরে বাবুদের মেয়ে চানও নি দারুকেশ্বর। সেই সব ইস্কুল কলেজে-পড়া মেয়েদের স্বভাব-চরিত্রের ওপর এক ফোঁটাও আস্থা নেই তাঁর। নগরবাসী মেয়েরা যে বিলাসিতায় বারবনিতাদেরও হার মানাতে পারে এ তো তিনি রাস্তায় বেরুলেই দেখতে পান। তারা কি কারো ঘরের বৌ হবার যোগ্য? সুতরাং দুই বৌ-ই তিনি গ্রাম থেকে আনলেন?

এক বৌ এলো বালেশ্বর থেকে, আর এক বৌ নবদ্বীপ। দু'জন কুটুম্বই তাঁর এই মাত্র উঠতি দুই সম্পন্ন গৃহস্থ। এখানে মেয়ে দিতে পেরে তারা বরং কৃতার্থই হলো। দারুকেশ্বর মেয়েদের চেহারার দিকে নজর দিলেন না, বংশের দিকেও না, শিক্ষার দিকে তো নয়ই। দৃষ্টি অর্জুনের লক্ষভেদের মতো যেদিকে একাগ্র ছিলো, সেটা ভালোই হাতে পেলেন। তবু মেয়ে দু'টি এমন কিছু কালোকুচ্ছিত হলো না, বংশমর্যাদায়ও খুব বেশী নিকৃষ্ট হ'লো না। দুটি মেয়ের স্বভাবও বেশ নরম সরম বলেই মনে হ'লো। এতো বড়োলোক শ্বশুর-পুত্রদের সাজ-সজ্জা চেহারা চলন বলন সংসার দেখে তাদের মনে যে কোনো কিন্তু ভাব হ'য়েছে তা-ও বোঝা গেলো না কোনো ব্যবহারে। শ্বশুরের অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধীনস্থ হ'য়ে কয়েক দিনের মধ্যে তারাও যেন ঠিক সেই বাড়িরই আচার আচরণের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো!

ছোটো ছেলের বিয়ে হ'লো এদের বছর চারেক পরে। এই বৌ এলো পূর্ববাংলার কোনো এক পড়ন্ত জমিদারের ঘর থেকে। এই ছেলে দিয়ে দারুকেশ্বর আরো বেশী টাকা পেলেন। সম্বন্ধটা দূরে দূরে প্রায় পত্রালাপেই স্থির হ'য়ে গেল। মেয়েও দেখলেন না তিনি। শুনলেন রং কালো। ভাবলেন, কানা-খোঁড়া তো আর নয়। আর তা যদি হয়ই, তাড়িয়ে দিলেই হবে। তাঁর ছেলে তো কানা-খোঁড়া নয়, আবার বিয়ে দিতে ক'দিন। তবু মেয়ের দাদা একটা ফটো পাঠিয়ে দিলেন। তারপর একদিন সেই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের চৌকো বারান্দায় যেখানে দারুকেশ্বরের ছোট ছেলে এতো দিন চট টাঙিয়ে একা ঘুমোতো, সেখানে কাঠের ফ্রেমে ক্যানভাস লাগানো খুপরিতে

শাঁখ বাজিয়ে ছোটো বৌকে বরণ করা হলো। আসবাবপত্রের মধ্যে তো একটা বড়ো তক্তপোষ, সেই তক্তপোষটা সহজেই ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। আর তক্তপোষই যখন ঢুকলো, তখন আর ভাবনা রইলো কী? দড়ি টাঙিয়ে কাপড় রাখো আর চৌকিতে শুয়ে রাত কাটাও। ঘরের তো এই প্রয়োজন। অবিশ্যি ট্রাঙ্ক বাক্সগুলোও রাখতে হবে বৈ কি। তার জায়গাও হ'লো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সবাই। তিনখানা ঘরের কোন্ ঘরে যে এদের জায়গা দেওয়া হবে তাই নিয়ে ক'দিন থেকে একটু ভাবাভাবি চলছিল। ঘরটা তৈরী হবার পরেও নবদম্পতির পক্ষে ঘরখানা ঠিক হ'লো কিনা এ নিয়ে একটা দ্বিধা ছিলো সকলের মনে। বড়ো ছেলে ভদ্রতা ক'রে বলেছিলো, 'আমি বরং এই বারান্দায় থাকি, সর্বা নতুন বৌমাকে নিয়ে আমার ঘরে যাক।'

তৎক্ষণাৎ মেজ ছেলে বলেছিলো, 'না, না, 'তা কখনো হয়? আপনি কেন যাবেন, আমিই বরং যাই।'

সর্বেশ্বর বলেছিলো, 'কারোকেই যেতে হবে না, এই ঘরই আমার ভালো।'

বৌরা নিভৃতে খেতে বসে বলেছিলো, 'ঐটুকু ঘরে যদি বা ছোটো ঠাকুরপো বৌ নিয়ে কোনো রকমে ঢুকতে পারে, তিন-চারজন বাচ্চা নিয়ে আমাদের ঢুকতে হ'লেই হয়েছে। তারপর সজনের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে গলা খাটো করে বলেছিলো 'কেন, ঐ বুড়ো গিয়ে থাকুক না বারান্দায়। একটাই তো মানুষ। সেদিকে আঁটো আছে। কেমন সবচেয়ে খোলা মেলা বড়ো ঘরটা নিয়ে মজা ক'রে ছড়িয়ে আছে। এদিকে দধীচির হাড়, শীগ্গির যে ঘর খালি হবে এমন সম্ভাবনাও নেই।'

তক্ষুণি বাইরে খট্‌খট্‌ খড়মের আওয়াজে চকিত হয়ে মেজ বৌ তার ফিসফিসে গলা ঈষৎ উঁচু পর্দায় তুলে বললো, 'বাবা যদ্দিন বেঁচে আছেন, তদ্দিনই যা আছি। তাঁর দয়াতেই তাঁর ছেলেরা তবু ক'রে কম্মে খাচ্ছে, আর আমরাও নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে দুই চাকর খাটিয়ে পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে আছি।'

বড়ো বৌ বললো, 'সত্যি, বাবার যখন শরীর এমন তেমন হয় আমার বুকের মধ্যে কী রকম'—খড়মের আওয়াজ বারান্দা বেয়ে বাথরুমে গিয়ে মিশলো।

৩

যাই হোক, ঘরখানা যতো ছোটোই হোক, দু'জনের শোবার মতো বড়ো সড়ো একখানা তক্তপোষ ঢুকে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত হ'লো সবাই। কিন্তু বৌকে নিয়ে প্রথমদিন যখন সেই ঘরে রাত কাটালো সর্বেশ্বর, তার যেন কেমন অন্য রকম লাগলো মানুষটাকে। তার মনের জগতে ঠিক এই ধরণের কোন মেয়ের কল্পনা ছিলো না। বৌদিদের তার এ রকম লাগেনি। মধ্যি-রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখলো বৌ বিছানায় নেই। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলো, চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা ঘরে ঐ একটাই জানালা। কিন্তু ঘরের তুলনায় যথেষ্ট বড়ো। আলো-হাওয়ার অবাধ প্রবেশের জন্য স্বেচ্ছাকৃত বড়ো নয়। ক্যানভাসে কম পড়ে যাওয়ায় দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরের জন্য তিন ফুট বাই দুই ফুট জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে। জানালার পাট নেই তাতে, পুরানো চটের পর্দা আছে একটি।

মধ্যিরাত্রে ঘুম ভেঙে যাওয়াটা সর্বেশ্বরের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সম্ভব তো নয়ই। সারাদিন খাটে, বাড়ি এসে পেট ভ'রে মোটা চালের ভাত ডাল তরকারী দিয়ে মেখে খায় আর রাত্রিবেলা নিশ্ছিদ্র ঘুম লাগায়। এই তার চিরাচরিত অভ্যাস। যখন ছাত্র ছিলো, পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তখনো এই অভ্যাস থেকে চ্যুত হয়নি সে। দারুকেশ্বর রাত জাগতে দেননি ছেলেদের। রাত জাগার বদলে ভোর চারটায় উঠিয়ে পড়া মুখস্থ করিয়েছেন নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া সারাদিন সেই পড়া মুখস্থই চলেছে। যিনি মাষ্টার ছিলেন, অর্থাৎ গার্জেন টিউটার, তিনি একটি বেত হাতে নিয়ে সতর্ক প্রহরীর মতো পাহারা দিয়েছেন। এই পাহারা শুধু পরীক্ষার সময়েই না বারোমাসই চলেছে তাদের ওপর। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উদয় অস্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন সেই মাষ্টার। যখন স্কুলে যেতো তিন ভাই, তখনও মাষ্টার মশাই গিয়ে দিয়ে আসতেন তাদের। স্কুলের ঘণ্টাটি না বাজা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেন, যাতে অন্য ছেলেদের সঙ্গে না মেশে, না খেলে, আবার টিফিনেব সময় তিনি উপস্থিত। টিফিনের ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত সেই পাহারা। তারপর ছুটি। ছুটিতে বাড়ি নিয়ে এসে নিশ্চিন্ত।

দারুকেশ্বরের এই হুকুম, এই নিয়ম। আশ্চর্য তবু এই নিয়ম ভঙ্গ করে বড় ছেলে রোহিতেশ্বর তেরো বছর বয়সেই লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকতে শিখেছিলো। ওভারসিয়ারি পড়াকালীন আরো যে সব গুণ একে একে সে আয়ত্ত করেছিলো তার কোনোটাই সুখশ্রাব্য নয়। মেজ জনও বড় জনের আদর্শে বেশ

ভালো ভাবেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠছিলো, বিয়ে ক'রে অনেক ঠাণ্ডা হ'য়েছে। ঠাণ্ডা অবিশ্যি বড় জনও হ'য়েছে, কিন্তু মিথ্যা কথা বলা বা প্রবঞ্চনা করার নেশাটা তার আজও কাটেনি। আর সেই প্রবঞ্চনা সে তার পিতার সঙ্গেই বেশী করে। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। দারুকেশ্বরের শাসনের তলা দিয়ে পিঁপড়ে গলবার ছিদ্রটুকুও তিনি রাখতে চাননি, অথচ হাতী গলে গেছে।

শুধু একটা বিষয়েই তাঁর সকল চেষ্টা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা সিদ্ধ হ'য়েছে, সেটা হচ্ছে বাপ বিষয়ে ছেলেদের অদ্ভুত ভয়, আতঙ্ক। এখনো এই বয়সেও ছেলে-বেলাকার সেই ভয় তাদের কাটেনি, আনুগত্য এতটুকু শিথিল হয়নি। আড়ালে যাই করুক, যাই বলুক, দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়ালেই সব ঠাণ্ডা। এ বিষয়ে বড়ো, মেজো, ছোটো সবাই সমান। বাপকে তারা বাঘের মতো ভয় করে। আর বাপের প্রভাবও তাদের ওপর বড়ো কম নয়। স্বভাবে চরিত্রে বাপকে তারা একেবারে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছে। তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিগুলি পিতারই অনুরূপ। বর্তমান জগতের আবহাওয়াকে তারাও দারুকেশ্বরের মতোই ঘৃণা করে। পয়সা খরচ ক'রে ফুটুনি করাকে সযত্নে পরিহার করে।

ছোটো ছেলে সর্বেশ্বরের সঙ্গে তার দাদাদের একটু তফাৎ ছিলো। ঈষৎ অন্যমনস্ক এবং উদাসীন স্বভাব ছিলো তার। সেটা তার পিতার শাসনের সুফল নয়। প্রকৃতিগত ভাবেই সে একটু বেশী শান্ত এবং চুপচাপ মানুষ। যে ভাবে যে নিয়মে

সংসার চলছে, সেও কিছু না ভেবেই ভেসে চলেছে সেই স্রোতে। তা নিয়ে আর মাথা ব্যথা নেই কোনো। ডাল-ভাত দিচ্ছ, তাই দাও। দুধ-ভাত দিলেও খরচের কথা ভেবে সে অস্থির হবে না। বাবা তাকে উকিল বানিয়েছেন, তাই সে হয়েছে। আজ যদি বলেন, সব ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারি পড়ো, তাতেও সে প্রশ্ন করবে না কিছু। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সে তার সামান্য প্রতিবাদ জানিয়েছিলো, বিয়ে করতে ইচ্ছে ছিলো না তার। অবিশ্যি বিয়ে দিতেও যে দারুকেশ্বর খুব কিছু উৎসুক ছিলেন, তা নয়। অন্য দুই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দেখছেন তো কী গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। আর জনসংখ্যা বাড়া মানেই খরচ বাড়া। দারুকেশ্বরের চোখ বেড়ালের চোখ। অন্ধকারেও জ্বলে। সেই অন্ধকারেই দৃষ্টি চালিয়ে দেখেছিলেন বড়ো দু'জনকে বিয়ে না দিলে তাদের ঘরে রাখা দায় হবে। ব্যবসায়ে মন বসানো কঠিন হবে। তাই পঁচিশ না পুরতেই এক বছরের আড়াআড়িতে ঘরে বৌ এনে ছেলেদের বাঁধলেন তিনি। আর তাদের খরচ-খরচা বাবদ কুটুম্বদের কাছ থেকে যে টাকাটা তিনি নগদে নিলেন ভেবে দেখলেন, তাতে বৌদের খাওয়া-পরার জন্য তাঁর নিজের পকেটে হাত না দিলেও অনেক দিন চলে যাবে।

ছোটো ছেলেকে নিয়ে কোনো ভাবনা ছিলো না তাঁর। তিনি জানতেন, এই ছেলের যদি কোনোদিনও বিয়ে না দেন, তবু তার চরিত্র খারাপ হবার একতিল আশঙ্কা নেই। যা খেতে দেবেন খাবে, যা পরতে দেবেন পরবে, আর যা করাবেন তাই করবে। কিন্তু সম্বন্ধটা এলো হঠাৎ। দারুকেশ্বরেরই এক ব্যবসায়ী বন্ধু কথাটা তুললেন। টাকার অঙ্কটা শুনে মনস্থির করতে সময়

লাগলো না দারুকেশ্বরের। কিন্তু সর্বেশ্বরের সময় লেগেছিলো। কেন লেগেছিলো কে জানে, কাজ করতে করতে সে উন্মনা হ'য়ে ভেবেছিলো বিয়ে আমি করবো না। কল্পনায় কোনো মেয়ের ছবি তাকে আকর্ষণ করেনি। যে দু'জন মেয়ে বৌ হ'য়ে এসেছে তাদের বাড়িতে, ঐ রকম আরেকটি মেয়ে এসে সংসারের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া আর যে কী সুখ হবে, ভেবে পায়নি। কিন্তু দারুকেশ্বর ঠিক করলে সে বেঠিক করবে, এতটা সাহস তার ছিলো না, উদ্যমও ছিলো না। দেখতে দেখতে এক জ্যৈষ্ঠের গরমে বিশেষ পিঁড়িতে গিয়ে বসলো সে।

মেয়ের দাদা তখনো পূর্ববাংলার মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। পাকিস্তান হয়ে যাবার পরে সাংঘাতিক গোলযোগের সময় একবার চলে এসেছিলেন বটে বছর খানেকের জন্য বাড়ি তালা বন্ধ করে, মিটে যেতেই ফিরে গেছেন আবার। রহমৎ তাঁর পিতার আমলের বিশ্বস্ত সর্দার বিপদে আপদে সে-ই পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে বুক ফুলিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লুঠ-তরাজের সময়েও তেমনিই দাঁড়িয়ে থেকে মুসলমান ঠেকিয়ে রক্ষা করেছে, মনিবপুত্রের শূন্য বাড়ি। অবস্থা শান্ত হ'লে সে-ই চিঠি লিখেছে, 'চলে আসুন, কোনো ভয় নেই।'

মুস্কিল বেধেছিলো বিবাহযোগ্যা এই বোনটিকে নিয়েই। নিজের তাঁর নাবালক তিনটি পুত্র। তাদের নিয়ে ভাবনা নেই, কিন্তু যুবতী বোনের চিন্তাতেই তিনি কাতর হ'য়ে পড়েছিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে গ্রামের বাড়িতে না ফিরে গিয়ে ঢাকার বাড়িতে এসে উঠলেন, চিঠি লিখে দেশ থেকে রহমৎকেও আনিয়ে নিলেন রক্ষক হিসেবে। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বোনের

বিয়ের জন্য। দিক্‌বিদিকে চর পাঠালেন একটি ভালো সম্বন্ধের খোঁজে। ঈশ্বর দয়া করলেন, মাত্র ছ'খানা পত্রের বিনিময়েই ঠিক হ'য়ে গেল সব। তারপর নিশ্চিন্ত মনে বোনের বিয়ে দিতে সপরিবারে কলকাতা বেলঘরিয়াতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসেই উঠলেন। গোলমালের সময় তিনি এই বেলঘরিয়াতেই ছিলেন, চেনা জায়গা।

সর্বেশ্বর তার বাবা এবং দাদাদের সঙ্গে সেজে গুজে সেখানেই বিয়ে করতে এলো। বিয়ের লগ্ন অনেক দেরিতে ছিলো, নববধুকে নিয়ে সে যখন নিভৃত হ'লো রাতের আর অবশিষ্ট ছিলো না কিছু। সে শুয়ে পড়লো ক্লান্ত হ'য়ে আর নতুন বৌ জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো চুপচাপ। বাসি বিয়ের দিন তো অমনিই গেল। ভালো ক'রে দেখা হ'লো শুভরাত্রির দিন। (শুভরাত্রিও তার শ্বশুরবাড়িতেই হ'য়েছিলো। নিজের বাড়িতে ঐ সব ঝামেলা দারুকেশ্বর কোনো ছেলের বিয়েতেই করেন নি।) সেদিন সর্বেশ্বরের বুকটা থরথর ক'রে কেঁপেছিলো। ঢাকাই শাড়িপরা স্বল্প ঘোমটা স্ত্রীকে ভীষণ ভালো লেগেছিলো। আগ্রহ ভরে সে তাকিয়েছিলো তার দিকে, ভাবছিলো কী কথা ব'লে আলাপ শুরু করবে, কিন্তু মেয়েটি সেদিনও তেমনি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। যখন রাত বাড়লো গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো এসে। প্রতীক্ষারত সর্বেশ্বর জেগে থেকেও কিছু বলতে সাহস পেলো না। কেবল মোটা শরীরটা নিয়ে কড়া গন্ধ তেল মাখা ছাঁটা মাথাটা (গন্ধ তেলটা বিয়ের জন্য কেনা) তুলিয়ে একবার উঠলো, একবার বসলো, একবার এ পাশ ফিরলো একবার ও পাশ ফিরলো এই ক'রে ক'রে শেষে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের ব্যাঘাত তার সেই প্রথম।

নিজের বাড়িতে এনে একটু সাহস বেড়েছিলো। প্রথম রাত্রে ছোটো বৌ ঘরে আসবার আগেই প্রতীক্ষা করতে করতে কখন জানি তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো তার। কিন্তু ভেঙে গেলো চট করে। তাকিয়ে সেদিনও বৌকে জানলায় দেখে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি, তক্তপোষ থেকে নামলো, এগিয়ে এসে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'এই যে, মানে, আমি—আমি বলছিলাম কি'—

ফিরে তাকালো ছোটো বৌ। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট করে তাকালো স্বামীর দিকে তারপর আবার নিঃশব্দে ফিরিয়ে নিল মুখ। সমস্ত সাহস ফুৎকারে নিবে গেল সর্বেশ্বরের। দাঁড়িয়ে থেকে ঘাম জমলো তাব।

৪

কিন্তু সর্বেশ্বরের যাই মনে হোক না কেন, বাইরে থেকে ছোটো বৌকে কিন্তু অন্য রকম কিছু লাগলো না। কেবল অন্য বৌদের তুলনায় একটু নির্লজ্জ। ভাসুরদের দেখলে তেমন করে ঘোমটা টেনে দেয় না, নির্ভয়ে শ্বশুরের ঘরে যায়। আরো একটু পুরোনো হলে, দেখা গেল দরকার মতো এটা-ওটা কিনতে বাইরে যাবারও বেশ অভ্যাস আছে। কেনার দবকার না থাকলে বিকেলে বাচ্চাদের হাত ধরে কাছেই কোনো ফাঁকা জায়গায় বেড়িয়ে আসে। তার জন্যও কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

এ নিয়ে বাড়িতে আলোচনা শুরু হ'তে দেরি হ'লো না খুব। বড়োবৌ মেজবৌ গুরুজন হিসেবে তা নিয়ে একটু আধটু শাসনও করলে, একথাও জানিয়ে দিলে শাশুড়ির অবর্তমানে তারাই তার অভিভাবক, তাদের কথাই তার একান্তভাবে মান্য করা উচিত। সব শুনে ছোটো বৌ হাতের কাজ থামিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলো একটু, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে অসমাপ্ত কাজ শেষ করলো। কিন্তু তারপরেও তাকে শোধরাতে দেখা গেলো না।

সুতরাং বিষয়টা অবহেলার যোগ্য নয়। এক কান দু কান হয়ে দারুকেশ্বরের কানেও পেঁছুলো কথাটা। তারপর কোনো এক রাত্রে বাড়ি নিঃশব্দ হ'লে, অতি নীরবে একদিন তিনি ছোটো ছেলের দরজায় এসে টোকা দিলেন। ভিতর থেকে সর্বেশ্বর বললো, 'কে, কী চাই ?'

দারুকেশ্বরের গলা জলদগম্ভীর হ'লো, তিনি বললেন, 'আমি। খোলো।'

সর্বেশ্বর এবার সন্ত্রস্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, কম্পিত গলায় বললো, 'আপনি !' দারুকেশ্বর জবাব দিলেন না। চুপ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সর্বেশ্বরের চিরদিনের কদমছাঁট চুলগুলো হঠাৎ যেন বড্ড বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হ'লো তাঁর। তিনি দেখলেন সেগুলো আর আগের মতো পাপোষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকছে না মাথার জমিতে, কপাল বেয়ে নেমে আসতে চাইছে চোখের পল্লব ছুঁয়ে। পায়ে কাঠের খড়মের বদলে চামড়ার নূতন স্যাণ্ডেল, পরনের ধুতিটির বহর পায়ের পাতার কাছাকাছি, গায়ে ফতুয়ার বদলে ফর্সা পাৎলা গেঞ্জি। প্রায় চেনা যাচ্ছে না, আগের সর্বেশ্বর বলে।

বিশ্রী মোটা গড়নটা যেন অনেকটা ছিপ্‌ছিপে দেখাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক দেখলেন তিনি, তারপর ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে উড়ন্ত পর্দা নাকে লেগে বাধা দিল। (আবার পর্দা ! হায় ! হায় ! যাবেন কোথায় !) আর তারি ফাঁকে লক্ষ্য করলেন খাকি রংয়ের ক্যানভাসগুলোকে ধবধবে সাদা রং দিয়ে ঠিক দেয়ালের মতো চেহারা করা হ'য়েছে আর তারি তলায় এই রাত্রিবেলা বৌমা একখানা আয়নার কাছে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। সেই আয়নাটি এক বিঘৎ লম্বা আধ বিঘৎ চওড়া, কেমিকেল ফ্রেমের আয়না নয়, যে আয়না দেয়ালের পেরেকে লট্‌কে থেকে মুখ দেখায়। বেশ বড়ো সড়ো হেলান দিয়ে বসানো আয়না।

একটি কথা বললেন না, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। ডাক পড়লো পরের মাসের পয়লা তারিখে।

'আজ্ঞে, আমাকে ডেকেছেন ?' অবনত ছোটো পুত্র পিতার চোখের তলায় এসে দাঁড়ালো নম্র হয়ে।

'হ্যাঁ।' দারুকেশ্বরের গলা আগুনের মত।

'বলুন।'

'কোর্ট থেকে ফিরলে ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ'

'আজকে তোমাদের মাইনে নেবার তারিখ, জানো বোধ হয় ?'

'আজ্ঞে, জানি।'

'রোহিতেশ্বর আর মহেশ্বর তাদেরটা পেয়ে গেছে।'

একটু চুপ করলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার নিজের

উপার্জনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট, আমায় আর আলাদা ক'রে দেবার দরকার নেই।'

'কী বলছেন?' সর্বেশ্বর বুঝতে পারলো না কথাটা।

বলছিলাম, 'তোমার আয় তো আজকাল বেশ ভালোই হয়, তবে আর মিছিমিছি আমার কাছ থেকে নিচ্ছ কেন?'

অবাক হ'য়ে দারুকেশ্বরের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো সর্বেশ্বর। নেহাৎই ওকালতি পাশ করেছে, নিয়ম রক্ষার্থে যেতেই হয় কোর্টে, নামটা রাখতেই হয়। কিন্তু তেমন উঠে-পড়ে লেগে কি প্র্যাক্‌টিস ক'রে নাকি সে? সময় কোথায়? ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলাতেই তো ব্যস্ত থাকতে হয় সারা বছর। নিজেদের কারবারেরই বাঁধা উকিল সে। দারুকেশ্বর তাকে দিয়ে 'হয়' কে 'নয়' করাচ্ছেন আর 'নয়' কে 'হয়', 'দিন' কে 'রাত' করাচ্ছেন, আর 'রাত' কে 'দিন'। একে ঠকাচ্ছেন, ওকে ঠকাচ্ছেন, ভাগীদারদের দিচ্ছেন না তাদের ন্যায্য অংশ, অন্যায় ক'রে ফ্যাঁসাদে পড়ছেন, আর মুক্তি পাচ্ছেন। আর তার জন্য ছেলেকে বেঁধে রেখেছেন একশো সাত টাকা মাইনে দিয়ে। সাত টাকা তার যাতায়াতের খরচ, বাকীটা মাইনে। খাওয়াটা অবিশ্যি ফ্রি। থাকারও সিট-রেণ্ট নেই।

সেই একশো টাকাতে আজকাল আর চলতে চাইছে না সর্বেশ্বরের। কোথাও যেতে হলে সেই টাকা থেকেই খরচ করতে হয়, যতো অল্প মূল্যেরই হোক, জামা-কাপড়ও কিনতে হয় তা থেকে, জলখাবারের খরচটাও নিজের। আবার কেমন ক'রে একটু বারে বারে চা খাবার বদভ্যাস হ'য়েছে। আর বাবা বলছেন তার নিজের উপার্জনই যথেষ্ট, মাইনে না নিলেও চলবে। বলছেন কী! বিয়ের আগে বলেছিলেন, বিয়ের পরে দশ টাকা

বাড়িয়ে দেবেন, কী কারণে বিরূপ হয়েছেন কে জানে, সে কথাও রাখেন নি তিনি। ওকালতিতে কোনো মাসে ষাট, কোনো মাসে সত্তর পেলে যথেষ্ট। বরং সেদিক থেকে দাদারা ভালো আছে তার থেকে। বাবা তাদের দিচ্ছেন, দুশো করে, বেশীর ভাগ সময়েই তারা কলকাতার বাইরে থাকে, সেজন্য ট্যুরিং এলাউন্সও আলাদা আছে। তার উপরে কেনাকাটার ব্যাপারে দুই দাদাই বেশ 'ইয়ে' করে। সর্বেশ্বর জানে বাবার কাছে ওরা যতোই বিনীত হয়ে থাকুক, আর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাক, যা তা বলে হিসেব বোঝাতে ওদের জুড়ি নেই। আগে, শরীর সমর্থ থাকতে দারুকেশ্বর নিজে নিয়মিত কারখানায় যেতেন, একটি পয়সা তাঁর গরমিল হতো না। কিনতে কাটতে নিজেই বাইরে যেতেন, এখন আর পারেন না। কাজেই সম্পূর্ণ ভাবেই ছেলেদের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। আর হয় বলেই ছেলেরা যা বোঝায় বিশ্বাস না করলেও মেনে নিতে হয়।

বেশী চাপাচাপি করলে আবার তারা সবিনয়ে পদত্যাগ-পত্র দিতে চায় আজকাল। উকিল না হলে চলে, ইঞ্জিনিয়ার অপরিহার্য। তা ছাড়া ঘরের ছেলে, ব্যবসাটা নিজেদের, প্রাণ দিয়ে তারা খাটে, প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি, একটা বড়ো অর্ডার পাবার জন্য সব তুচ্ছ করে ছুটে যায় কোথায়-কোথায়। এ কথা আর কে না জানে, এর সর্বময় কর্তা একদিন তারাই হবে। সত্যি বলতে দারুকেশ্বর আর ক'দিন। তাই বাপকে তারা যেমন নরমে গরমে রাখে, বাপও তাদের তাই করেন। নরম গরমটা সর্বেশ্বরেরই শুধু ভালো আসে না। বাপকে ভক্তি-শ্রদ্ধা কতোটা করে তার হিসেব সে করে দেখেনি, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালোওবাসে, প্রবঞ্চনা করবার কথা

কল্পনা করে না। মাঝে মাঝে যখন ব্লাডপ্রেসারের অতিবৃদ্ধিতে দারুকেশ্বর মরণাপন্ন হন তখন তার চোখে যে জল আসে তার মধ্যে মেকি নেই কোনো। দাদারা যখন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় শব্দ করে কেঁদে পাশের ঘরে এসেই জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে সব্বা, মস্ত তো বিদ্বান হয়েছিস, নাড়ী দেখে বলতো, বুড়ো ঠিকই এবার টেঁসবে, না আবার উঠে বসে হিসেবপত্র মেলাবে ?' তখন দাদাদের উপর সে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়। আজকে দারুকেশ্বরের এই অদ্ভুত প্রশ্নে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থেকে বললো, 'আমার আবার আয় কী ?'

দারুকেশ্বর বললেন, 'কেন, তুমি তো ডেলি বাড়ির ভাত খেয়ে আলিপুর যাচ্ছ, ফিরে আসছো সন্ধ্যায়। গিয়ে তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটো না। সত্যি সত্যি কতো টাকা তুমি রোজগার করো ওকালতি করে, সেটা আমার জানা দরকার।'

'আপনি তা জানেন।'

'কী ক'রে জানবো ? তুমি যখন ফিরে আসো আমি তোমার পকেটে হাত দিযে সার্চ করি না যে, চুপে চুপে কি নিয়ে আসো, জানতে পারবো সেটা ?'

আহত হ'লো সর্বেশ্বর, গম্ভীর থেকে বললো, 'ওকালতিতে পসার জমাতে হ'লে তার কতোগুলো আয়োজন আছে। আমাব কোনো চেম্বার নেই, বই নেই, নিজেদের ব্যবসায় আছি বলে তেমন সচেষ্ট হ'য়ে উপার্জন করবার সময় বা মনোযোগ কোনোটাই নেই। কাজেই কোর্ট থেকে ফিরলেই যে পকেট আমার বোঝাই হ'য়ে উঠবে না, সেটা কি না জানা বিষয় ?'

দারুকেশ্বর এবার আসল কথায় এলেন, 'তা বড়োলোকের মতো ঘরের রঙিন পর্দা যখন ফুর ফুর ক'রে বাতাসে ওড়ে,

ক্যানভ্যাসে দেয়ালের রং ওঠে আর রাত করে মুখ দেখার চকচকে আয়না ঝিলিক দেয় তখন তো তোমাকে খুব শূন্যগর্ভ বলে মনে হয় না সর্বেশ্বর !'

'ও, এই কথা !' সর্বেশ্বর ঢোক গিললো, 'ও-সব আমি—মানে আমি ও-সব কিনিনি ।'

'হট হট ক'রে বেরিয়ে গিয়ে তোমার বৌ যে নিজেই হাট-বাজার ক'রে সে সব কিনে নিয়ে আসতে পারেন, তা আমি জানি, কিন্তু টাকাটা তিনি পান কোথায় সেটাই আমার জানা দরকার। আশা করি তুমিই দাও ।'

সর্বেশ্বর চুপ ।

'মেয়েছেলের কথায় ওঠো বসো, লজ্জা নেই তোমার ?'

সর্বেশ্বর চুপ ।

'শাসন করতে পারো না ? বলতে পারো না, এটা গৃহস্থের বাড়ি ।'

চুপ ।

'আর মাথার চুলগুলো ? ওগুলো অত বড়ো করেছ কেন ? ঘর সাজাতে যতো পয়সা লেগেছে, চুল না ছেঁটে তা উশুল করবে বুঝি ? নাপিতের চার আনা বাঁচিয়ে চারশো টাকার আসবাব কিনবে, না ? আর বাবু-বহরের কোকিল পাড় ধুতি,—'

দরজার দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ থেমে গেলেন দারুকেশ্বর। ধীর পায়ে ছোটো বৌ এসে ঘরে ঢুকলো। হাতে কাঁসার থালার ওপর বসানো শ্বশুরের বৈকালিক আহার। দুধ, কলা, মুড়ি। বৌটির বেশ ফিটফাট চেহারা, রং ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, ঈষৎ সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে ! খাবারটা সামনে একটা টুলের উপর নামিয়ে রাখলো সে।

মাথায় আধো ঘোমটা, স্বামীকে দেখে সে ঘোমটা একটুও নামলো না যেটা অন্য বৌরা সর্বদাই ক'রে থাকে, উপরন্তু দরজার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা দারুকেশ্বরের আলাদা ভৃত্য নিবারণকে স্পষ্টগলায় ডাকলো, 'নিবারণ!' হুকুমের স্বরে বললো, 'এখনো ঘর পরিষ্কার করো নি যে?'

'আজ্ঞে, কত্তাবাবু, কথা বলতিছিলেন।'

'তোমার সঙ্গে বলছিলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তা হ'লে তুমি দাঁড়িয়ে কী শুনছো?'

'আজ্ঞে—মানে—'

'তোমাকে এর আগেও একদিন বলেছি, আজ আবার বলছি বেলা চারটের মধ্যে এ ঘর তুমি পরিষ্কার ক'রে রাখবে। এটা আপিস, এখানে লোকজন আসে। যাও, আর যেন কখনো বলতে না হয়।'

খাবারের থালাটা ছোটো বৌ টেবিলের উপর রাখলো। নিবারণ সভয়ে দ্রুত হাতে গোছগাছ করতে মন দিল।

কিংকর্তব্য সর্বেশ্বর আড়চোখে স্ত্রীর দিকে একপলক দেখেই সরিয়ে নিল চোখ, তারপর একবার এদিকে তাকালো, ওদিকে তাকালো, ঠোঁট চাটলো জিব দিয়ে, শেষে গলা বন্ধ কালো কোটের বোতামটা খুঁটতে লাগলো। আর তার বাবা দুর্দান্ত দারুকেশ্বর ভালোমানুষের মতো খাবারের থালাটা কাছে টেনে নিয়ে দুধের বাটিতে কলা চটকাতে চটকাতে বললেন 'ঠিক আছে যাও। এ মাসের মাইনে আমি তোমাকে দেবো কিন্তু তুমিও একটু সাবধান মতো চলাফেরা কোরো।' সর্বেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো।

৫

সেদিন রাত্রিতে শুতে এসে ছোটো বৌ স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে হাসলো একটু। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সর্বেশ্বর বললো—'কী?'

'কিছু না।'

'কী যেন ভাবছিলে।'

'তোমার সমস্যার কথাটা ভাবছিলাম।'

'আমার সমস্যা? আমার আবার সমস্যা কী?'

'প্রত্যেক মানুষেরই যেমন একটা আলাদা রক্ত-মাংসের শরীর আছে, একটা আলাদা মনও আছে সেই মনটা বোধ হয় তুমি খুঁজে পাচ্ছো না।'

'এ্যাঁ, কী!'

'অন্যের ইচ্ছার ছায়া হ'য়ে বেঁচে থাকা, সেও এক রকমের মৃত্যু।'

'মৃত্যু!'

'বলছি, সাবালক হও।'

'কী!'

'বয়সটাই বেড়েছে, মানুষটা এখনো বড়ো হওনি।'

ছোটো বৌ যথারীতি অন্যদিনের মতো আয়নার সামনে গিয়ে চুলে বেণী পাকাতে বসলো। স্ত্রীর এসব রহস্যপূর্ণ কথা সব সময় বুঝতে পারে না সর্বেশ্বর। রাগ হয়, ভয় হয়, সম্ভ্রম হয়। সর্বেশ্বর তাকিয়ে তাকিয়ে স্ত্রীর চুল আঁচড়াবার ভঙ্গি দেখতে দেখতে আজ ভারি অস্থির বোধ করলো। সেদিক থেকে চোখ

সরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো সে। ভাবতে চেষ্টা করলো, তার দাদাদের ঘরে তার বৌদিরাও এই সময়ে ঠিক এই রকম ক'রেই কথা বলছে কিনা। ভাবতে চেষ্টা করলো এই বৌটির সঙ্গে সেই দু'টি বৌ-এর কোথাও কোনো মিল আছে কিনা। সে নিশ্চিত জানে নেই। সে জানে রাত দশটার অন্তরঙ্গ ঘরে তারা দু'জনের একজনও এখন জেগে থেকে এই ভাষায় কথা বলছে না স্বামীর সঙ্গে, এমন সুন্দর ব্যবধান রচনা ক'রে কষ্ট দিচ্ছে না তাদের। আলো জ্বালিয়ে আয়নার কাছে বসে চুল বাঁধবার কথা কল্পনায়ও আনছে না তারা। স্ত্রীলোক হ'য়ে রাত্রিবেলা যে আয়নায় মুখ দেখতে নেই একথা তারা জানে, মানে। সর্বেশ্বর দেখেছে রাত্রিবেলা বৌদিরা আয়নাগুলো ঢেকে রাখে। ছেলেবেলায় দিদিকেও তাই করতে দেখেছে সে। ধু ধু মনে পড়ে অনেকদিন আগে মা নামক একজন মানুষ ছিলেন এই বাড়িতে, তিনি বেলা পড়তেই দিদির চুল বেঁধে দিতেন, গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে টিপ পরিয়ে দিতেন। তারপর একদিন তিনি কোথায় চলে গেলেন, বদলে একজন দাসী নিয়ে এলেন বাবা, সেও তেমনি ক'রে চুল বেঁধে দিত দিদির। সন্ধ্যার পরে কখনো কোনো কারণে দিদি আয়নায় মুখ দেখলে বলতো, 'সূর্যদেব পাটে বসেছেন না? এখন কি ওরকম মুখ দেখতে হয়? তাছাড়া রাত্রিবেলা ওরকম আয়নায় মুখ দেখে কারা সাজে বলো তো?'

'কারা সাজে?' মনে মনে ভাবতো সর্বেশ্বর। উত্তর খুঁজে পেতো না। বড়ো হ'য়ে জেনেছে সে কথা।

তারপর কতোদিন চলে গেছে, ভুলে গেছে সে সব দিন, বছরের পর বছর কেটে গেছে এক স্ত্রীলোকহীন সংসারে। তারপর আবার বৌদিরা এলো। আবার তারা বেলা পড়তেই

দিদির মতো করে দাঁতে [illegible] চেপে চুল বাঁধতে বসলো শক্ত ক'রে ; তারপর গা ধুয়ে প্রসাধন। শুধু ছোট বৌ-ই সংসারের সব নিয়মের ব্যতিক্রম। বিকেলে সে চুল বাঁধে ঠিকই, কিন্তু সে অন্যরকম বেণী ক'রে বাঁধে রাত্রিবেলা, ঠিক শোবার আগে। ছোটো বৌ কেমন সকলের চেয়ে আলাদা—

শুয়ে শুয়ে আরো অনেক কথা ভাবে সর্বেশ্বর। ছেলে-বেলাকার কথা ভাবে, ছাত্রবেলার কথা ভাবে, উপার্জনের কথা ভাবে। বাবা আজ তাকে যে-সব কথা বলেছেন, সে-সব কথার মর্মার্থও গ্রহণ করতে চেষ্টা করে মনের মধ্যে। বাবার আদর্শের সঙ্গে ইদানীং তার জীবনযাপন পদ্ধতির যে একটু গরমিল দেখা দিয়েছে সে-কথা সে নিজেই বুঝতে পেরেছে। শিক্ষাদাতা হিসেবে দারুকেশ্বরকে সে কোনদিন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেনি। অন্ধের মতো মান্য করেছে, অনুসরণ করেছে। দারুকেশ্বর চিরদিন তাদের বুঝিয়েছেন, শিখিয়েছেন, কাপড় পরতে হয় লজ্জা নিবারণের জন্য, খেতে হয় ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, আর ঘুমিয়ে পড়তে হয় বিশ্রামের জন্য। এর মধ্যে কোনো বাহুল্যের জায়গা নেই জীবনে। এমন একটা কথা বলবার সাহসই তাদের কোনোদিন হয়নি, যে বলবে এ ধুতিটা চাই না সে ধুতিটা চাই, এটা বড়ো মোটা অথবা সেটা বেঁটে। এ পাড়টা ভালো না বা এ রংটা বিশ্রী। বলবার কথা ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। খাওয়া বিষয়েও ঠিক তাই। খাবে খাও। পেট ভরলেই হ'লো, তা নিয়ে আবার খুঁত খুঁত কী? কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ মাংস খেয়ে পয়সা খরচ ছাড়া আর কী মোক্ষলাভ হয়? কেবল জিহ্বাকে ছোটলোক বানানো। স্বাদের জন্য তো নুনই আছে। নুন

ভাতই যথেষ্ট, তবু তো দারুকেশ্বর রোজ কিছু না কিছু তরকারী আনান বাজার থেকে, ডাল কেনেন। এমন কি কোনো কোনো দিন তেল খরচ ক'রে ঢেঁড়স ভাজাও হয় ডালের সঙ্গে মুখে দিয়ে খাবার জন্য। এরপর আর কী চাই। যদি কেউ চায়, সেটার নামই লোভ, সেটার নামই বিলাসিতা। সেই রিপুকে যতো প্রশ্রয় দেবে ততোই সে আগুনের মতো লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠে সর্বনাশ করবে গৃহস্থের। পাপে ছেয়ে যাবে সংসার।

৬

অবিশ্যি এ নিয়ম দারুকেশ্বর নিজের উপর খাটান না, বয়েস হয়েছে একটু বেশী খাওয়া তাঁর দরকার, একটু এটা ওটা দিয়ে ভোঁতা রসনাকে শাণিত করা প্রয়োজন। তাই তিনি না হয় নিবারণকে দিয়ে যখন তখন যা তা আনিয়ে খান। রক্ত যাদের গরম, সেই সব জোয়ানদের কথা ওঠে কিসে?

আর বিশ্রাম! খালি তক্তপোষ তো পড়েই আছে ঘরে ঘরে, গড়াও না যতো খুশি। (গরম কালে তক্তপোষেরই বা দরকার কী? মেঝেতেই আরাম। তবু একটু বিশ্রাম পাবে চৌকিটা, আর একটা বছর বেশী টিঁকবে।)

কিন্তু তাই বলে তক্তপোষের উপর বিছানা পাত্‌তে পারবে না দিনের বেলা। দারুকেশ্বর অবিবেচক নন, রাত্রিবেলার জন্য তিনি ছেলেদের তোষকও দিয়েছেন, বালিশও দিয়েছেন, চাদরও দিয়েছেন। কিন্তু দিনের বেলা সে সব ছোঁবার নিয়ম নেই। সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই বৌরা সেগুলো পরিপাটি ক'রে ভাঁজ করে, তারপর যার যার ঘরের এক কোণে টুল বা ট্রাঙ্কের উপর

একটা পুরোনো কাপড় চাপা দিয়ে রেখে দেয়, দারুকেশ্বরের বিছানা তোলে নিবারণ। এই বুড়ো শরীর নিঁয়ে তিনিও সারাদিন ঐ শক্ত তক্তপোষেই গড়াগড়ি করেন। বেশী ব্যবহারে সব জিনিসেরই আয়ু কমে, তোষকটা ফেটে যায় যদি। যদি বালিশটার তুলো বেরিয়ে যায়। তখন? তখন সেই খেসারৎ দেবে কে? অবিশ্যি তোষক বালিশ দারুকেশ্বর শেষ যে কবে করিয়েছিলেন, চেষ্টা করেও মনে আনতে পারেন না। ছেলেদের বিয়ের পরে বৌরা যার যারটা তারা নিজেরা নিয়ে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে, দারুকেশ্বর বেঁচে গিয়েছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর বছর চারেকের মধ্যেই মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন দারুকেশ্বর, তারপর থেকে এই তিন ছেলে নিয়ে আছেন তিনি। মেয়ে বড়ো একটা আসে না বাপের বাড়িতে। তার ছেলেমেয়ে আছে কয়েকটি, সব ক'টিকে নিয়ে এলে দারুকেশ্বর বিরক্তি বোধ করেন। মেয়ে একা এলে তাঁর আপত্তি নেই, দু'-একদিনের জন্য জামাই এলেও না হয় চলতে পারে। আর দশজনের সঙ্গে মেয়ে-জামাইয়ের জন্যও না হয় দু' মুঠো বেশী ডাল-ভাত খরচ করা যাবে। কিন্তু শিশুদের ভিড় অসহ্য। সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান তো আছেই, তার উপর খাওয়া দাওয়ার ধুম কতো! ওদিকে ভাতও খাবে, সেদিকে দুধও খাবে আর জিনিসপত্র নষ্ট করবে না বুঝি? এটা ধাম্‌সাবে, ওটা মটকাবে, সারা বাড়ি উথাল-পাথাল। দেখছেন তো ছেলেদের ধুরন্ধরগুলোকে। বড়ো ছেলে দু'জনও তাতে বিরক্ত হয়, তারাও অকারণে এতো খরচ পছন্দ করে না।

কেবল সর্বেশ্বরই এ বিষয়ে একটু দুর্বল। দিদির উপর তার টানটা একটু বোকার মতো। অবিশ্যি অন্য বিষয়ে বাবার মতামতের ওপর তার কোনো আপত্তি নেই। দাদাদের মতো সে-ও বাপের কারবারে খেটে আর বাপের হোটেলে সাপটে ডাল-ভাত খেয়ে সুখেই আছে। মূঢ়ের মতো সংসারের আর পাঁচজন সাজের পুতুলের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হেঁটো ধুতিতে লজ্জা ঢেকে তক্তপোষের কঠিন কাঠে গড়িয়ে কোনো অভাববোধও পীড়িত করেনি হৃদয়কে। কিন্তু বিয়ের পরেই যেন ছবিটা পালটে যাচ্ছে ক্রমশ। ছিপ্‌ছিপে কালো মেয়েটির কাছে নিজেকে কেমন যেন অশোভন মনে হচ্ছে, অদ্ভুত লাগছে। ছোটো বৌ যখন রাত্রিবেলা ঘুমুতে এসে গম্ভীর মুখে তার থেকে অনেক দূরে শুয়ে পনেরো পাওয়ারের মিট্‌মিটে আলোয় কোনো একটা বই পড়ে মন দিয়ে, তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছট্‌ফট্ করে সর্বেশ্বর। নিজের স্ত্রী, তবু ভয় করে কাছে যেতে। যতো ভয় করে, ততো ইচ্ছের জোর বাড়ে, ততো সে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালোবাসার যন্ত্রণা অনুভব করে। তেলচুকচুকে ছাঁটা চুলে কারণে অকারণে চিরুণী চালায় (যা সে আগে কখনো করেনি) ঢোলা ফতুয়াটাকে এদিকে টানে, ওদিকে টানে, খাটো ধুতির মোটা কোঁচাটাকে গোঁজে আর খোলে। আর তারপর চকিতে দেয়ালের বড়ো আয়নাটাতে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু সেই বেঁটেখাটো লোমশ স্বামীটির দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না ছোটো বৌ, যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে সে ছাড়া আর কারো কোনো অস্তিত্ব নেই এমনি তার ভাব। শেষে একদিন মরিয়া হয়ে সর্বেশ্বর আলো নিবিয়ে দিয়ে চুম্বন করলো স্ত্রীকে,

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ভালোবাসো না, কিন্তু বলতে তো পারো কী করলে তোমার মন পাবো ?' বিবাহের পুরো তিন মাস পরে ছোটো বৌ সেই প্রথম স্বামীর সান্নিধ্যে ধরা দিল। প্রেমে ভরা দুটি মাংসল কালো হাতের বন্ধনে বুকের অন্ধকারে মুখ রেখে সে স্থির হয়ে রইলো।

৭

সকালবেলা বললো, 'আমার একটা কথা রাখবে ?'

রাখবে না! ছোটো বৌ বললে সর্বেশ্বর কী না পারে? আকাশের চাঁদ এনে দিতে বলো না, সমুদ্র সাঁতরে পার হতে বলো না, বলো না পর্বত ডিঙোতে, আগুনে ঝাঁপ দিতেই বা আপত্তি কিসের। অস্থির হ'য়ে গেল সেই কথা রাখবার ইচ্ছেতে। কাল রাত্রে একটা উত্তাল ঝড় বয়ে গেছে তার জীবনে। তার ঝাপ্‌টায় এখনো যেন কাঁপছে সে ভিতরে ভিতরে। কোমরে আঁটা লুঙ্গিটা একবার খুললো, একবার পরলো, তিনবার কাসলো, তিনবার এগুলো, দ্রুত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন রাখবো না, রাখবো।'

'আজকে তুমি চুল ছাঁটতে যেয়ো না।'

'এ্যাঁ, চুল! ও, আজ বুঝি চুল ছাঁটবার তারিখ? দাদারা ছাঁটছে বুঝি? আমাকে ডাকছে বুঝি?'

এ বাড়ির সব কাজ নিয়ম বাঁধা। ছেলেরা যে চুল ছাঁটবে, তারও তারিখ ঠিক করা আছে। মাসে একবার। প্রায় ন্যাড়া হয়ে যায় সেদিন। চিমটি দিয়েও ধরা যায় না সে চুল। তারপর

এক মাস পুরতে মাথার মাঝখানটা খাড়া খাড়া হয়ে ওঠে, ঘাড়ের দিকে চুল লম্বাটে হয়ে বেয়ে নামে, জুলপিটা বিশ্রীভাবে গালে সুড়সুড়ি দেয়। খিদিরপুর বস্তি থেকে বুড়ো হারান নাপিত এসে ছেঁটে দিয়ে যায়, পয়সা লাগে না।

তারিখটা ভুলে গিয়েছিলো সর্বেশ্বর। ভুলবারই কথা। আজও যদি সবকিছু ভুলে না যায় আর ভুলবে কবে। কাল রাত্রের সুখ সৌভাগ্য ছাড়া আজ সকালে আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব বা অর্থ ছিলো না তার কাছে। স্ত্রীর কথায় তাড়াতাড়ি খড়মটা পায়ে দিয়ে নিল, খটখট শব্দ ক'রে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল দরজা পর্যন্ত।

ছোটো বৌ বললো, 'শোনো—'

'এঁ্যা।'

'তোমার চুল এখনো ছাঁটবার মতো হয়নি।'

'কী ?'

'বলছি তোমার চুল ছাঁটার সময় হয়নি এখনো।'

'সময় ? সময়ের কথা কী ? আজ তো তারিখ।'

'চুল না বাড়লেও ছাঁটতে হবে ?'

'বাড়াবাড়ির কী ? তারিখ মতো ছাঁটবো না ?'

'না।'

'এঁ্যা !'

'আরো সপ্তাহ দেড়েক পরে ছাঁটবে।'

'সপ্তাহ দেড়েক পরে ? নাপিত ! নাপিত পাবো কোথায় ? হারাণ তো এ মাসে আর আসবে না।'

'হারাণ ছাড়া কি আর নাপিত নেই ?'

'কই না তো।'

'কী না তো।'

'হারাণ ছাড়া অন্য নাপিতে আর কোনোদিন ছাঁটি নি আমরা।'

'জন্ম থেকে এই নাপিতে ছাঁটছো?'

'হারাণের যে পয়সা লাগে না।'

'ও, তাই বলো।'

চুপ ক'রে গেল ছোটো বৌ। আর ছোটো বৌকে চুপ করতে দেখে ঘাবড়ে গেল সর্বেশ্বর। সে-ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো একটু। কপাল পিঠ ঘেমে গেল। বললো, 'তবে তুমি কী করতে বলো?'

'বলেছি তো।'

'চুল ছাঁটবো না আজ?'

'একটা কয়েদীর মতো চেহারা ক'রে রাখলে কি তোমাদের লোহার কারবারে কিছু বেশী আয় হবে?'

'কী?'

'চুল ছাঁটার বরাদ্দে চার আনা আট আনা খরচ করলে কি তিনখানা বাড়ির একখানা নীলামে উঠে যাবে?'

'কী সব বলছো?'

ছোটো বৌ উঠে কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো। 'চুলগুলো বড়ো হ'তে দাও, পায়ের খড়মটা ছেড়ে একটা চামড়ার জুতো কিনে পরো, হেঁটো ধুতি আর ফতুয়ার কবরেজী চেহারাটা বদলাও। সরে এসো জানালার ধারে আর আয়নায় তাকিয়ে নিজের বয়েসটা একবার ছাখো।'

কী বলবে সর্বেশ্বর! কী করবে। কী উত্তর দেবে স্ত্রীর এই

সব সাংঘাতিক ঘরভাঙানো কথায় ? হঠাৎ নিজেকে ফিরে পেয়ে সাহসের সঙ্গে বললো, 'তার মানে তুমি আমাকে কলকাতার বাবু হতে বলছো ? বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে বলছো ?'

'কলকাতার বাবু কা'কে বলে জানি না, আমরা কলকাতার লোক নই। ভদ্রলোক হ'তে বলছি। এর মধ্যে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কোনো প্রশ্ন নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।' এতোকালের সংস্কারে ঘা লেগেছে সর্বেশ্বরের। 'বাবা বিলাসিতা পছন্দ করেন না। বিলাসিতা পাপ।'

'অর্থগৃধ্নুতা যে তার চেয়েও বড়ো পাপ, সে-কথা বুঝি বলেননি ?'

'অর্থগৃধ্নুতা।'

'না খেয়ে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, না প'রে দেহকে কুৎসিত ক'রে রাখা, রাশি রাশি টাকা জমিয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়া, এর এক নাম অর্থগৃধ্নুতা, অপর নাম নরক।'

শুনতে শুনতে ঠোঁট কামড়ালো সর্বেশ্বর, ভারি গলায় বললো, 'আর বাবাকে অমান্য কবাটা স্বর্গ, না ?'

'বাবাকে অমান্য করার কথা উঠছে না এখানে।'

'নিশ্চয়ই উঠছে। এই নিয়ম তিনি করেছেন, ভাঙবার কর্তা আমি নই। যদি ভাঙি তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁকে অমান্য করা হবে।'

'মা বাবা তাঁদের অবোধ শিশু সন্তানের জন্যই এই সব আদেশ, উপদেশ, নিষেধ শাসনের গণ্ডি এঁকে রাখেন, বয়স্কদের জন্য নয়। বয়স্করা নিজেদের বুদ্ধিতেই জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, জলে ঝাঁপ দিলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকে।'

'এটা আর ওটা সমান হ'লো ?'

'তা তো হ'লোই। আটাশ বছর বয়সেও যে মানুষ নিজের বুদ্ধিতে চলতে পারে না, অন্যের ইচ্ছের পুতুল হ'য়ে খায় দায় ঘুমোয়, জেগে ওঠে, কাজে যায় তাকে আর যাই বলা যাক, মানুষ বলে না।'

'কী বলে ? অমানুষ ?' ফোলা গাল অসম্মানের বেদনায় লাল হ'লো সর্বেশ্বরের। ছোটো বউ জানালায় দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে মস্ত চুলের মোটা বেণীটা নরম হাতে খুলতে খুলতে মৃদুস্বরে বললো, 'না, অমানুষ নয়, ছেলেমানুষ। শিশু। অতবড়ো শরীরে শিশুতা শুধু বিসদৃশ নয়, অপরাধ।' বলতে বলতে কোনো দিকে না তাকিয়ে সর্বেশ্বরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সর্বেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ, তার পর ঠাস ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে ধড়াস ক'রে শুয়ে পড়লো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

এই পর্যন্ত হ'লো গল্পের ভূমিকা। আসল গল্প যেখানে শুরু সেখানে সর্বেশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। দারুকেশ্বরের ধমক খেয়ে প্রথমবার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু ছোটো বৌ-এর সাহায্যে সামলে উঠতেও দেরি হয়নি বেশী। চেহারার প্রতি ততোদিনে প্রেমে পড়ে গেছে সে। সে জেনেছে, বুঝেছে, আয়নায় দেখেছে একখানা বড়ো বহরের পাতলা ধুতি আর গেঞ্জি প'রে চলে-ফিরে বেড়ালে যেমন দেখায়, লুঙ্গি আর ফতুয়ায় তা দেখায় না। ঢেউখেলানো বড় চুলে চিরুণী চালিয়ে চেহারাটা যতো দুরন্ত হয়ে ওঠে, কদমছাঁট তেল-চুকচুকে নেড়া মাথায় তেমনি মর্কটের মতো দেখায়। ছোটো বৌ যা বলে সত্যিই তা নেহাৎ না ভাববার কথা নয়। এই বয়সেও যদি পাঁচ বছরের বালকের মতো বাবা কান ধরে ওঠান বসান, সেটা মোটেই সংগত নয়। মা-বাপ শিশুকেই শুধু ইজের পরিয়ে, কাজল বুলিয়ে, পাউডার মাখিয়ে আপন ইচ্ছেমতো সাজিয়ে দিতে পারেন, কী পরবে তা-ও ঠিক ক'রে দিতে পারেন। সে কোথায় যাবে আর না যাবে সেটাও তাঁদেরই হাতে। তাই ব'লে তার মতো একজন সাবালক ভদ্রলোককেও—না, না, ছি। সেটা খুব অন্যায়। খুব বিশ্রী। সেটা অনুচিত। অসংগত।

বলাই বাহুল্য, কিছুদিনের মধ্যেই গরমিলটা প্রকট হ'য়ে

উঠলো। শুধু জামা-কাপড় আর চুলের কাট-ছাঁটই নয়, মনের কাট-ছাঁটও বদলে গেল সর্বেশ্বরের। স্ত্রীর আয়নায় সে দেখতে পেলো নিজেকে, দেখতে পেলো পৃথিবীকে। জগৎ সংসারের দিকে এতোদিন চোখ তুলে তাকিয়ে চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল। জৈব প্রয়োজনটুকুর বাইরেও যে মানুষের জীবনে অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে হঠাৎ সেটা উপলব্ধি ক'রে ভারি ভালো লাগলো।

অনেকদিন আগে একদিন ছোটো বৌ তাকে জিজ্ঞেস করে-ছিলো, 'তুমি কখনো কবিতা পড়েছ ?'

সর্বেশ্বর তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলো, 'হ্যাঁ, কতো। ইস্কুলের বইয়ে পড়েছি, কলেজের বইয়ে পড়েছি—'

'না, না, সে রকম নয়,' অস্থির হ'য়ে ছোটো বৌ বাধা দিয়েছিলো। 'নিজের ইচ্ছেয় পড়েছো কি না, ভালো লাগে ব'লে পড়েছো কি না।'

সর্বেশ্বরকে মাথা চুলকোতে হলো। বুঝতে পারলো না, বাধ্য না হ'লে মানুষ খামোকা খামোকা কতকগুলো কবিতা পড়তে যাবে কেন ? এখন সে নিজে পড়ুক না পড়ুক, কেউ কেউ যে খামোকা কেন পড়ে আর কী সুখ পায়, তা যেন অনেকটা অনুভব করতে পারে। আর এটাও অনুভব করতে পারে, সময়ে অসময়ে ছোটো বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে কেন ? চাঁদ, তারা, ফুল, পাখী এদের সৃষ্টিও যে ঈশ্বরের রাজত্বে নেহাৎ অকারণ নয়, স্ত্রীকে ভালোবেসে সেটা বুঝতে আর কষ্ট হয় না তার।

ক্রমে ক্রমে এতোটাই পরিবর্তন হ'লো সর্বেশ্বরের যে গ্রীষ্মের বিকেলে কোনো কোনো দিন সে একটা বেলফুলের মালা হাতে

নিয়েও বাড়ি ফিরতে লাগলো। বড়ো বৌ, মেজো বৌ রকম-সকম দেখে হতবাক্। বড়ো ভাই, মেজো ভাই হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পেলো না। আর ছোটো বৌয়ের সাহসের তো কোনো অন্তই নেই। ঐ তো একটা পার্টিসন করা ঘর, পা ফেলবার জায়গা নেই। তার মধ্যে যে কী না ঢুকিয়েছে। এলানো বেতের চেয়ার কিনেছে একটি, তাতে আবার নিজেই সেলাই ক'রে রঙিন কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে নিয়েছে, পেতেছে জানালার তলায়। মাথার কাছে ছোটো আখরোট কাঠের টেবিল। কবে নাকি স্বামীর সঙ্গে নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছে সখ করে। বেহায়া আর কাকে বলে। আগে ক্যানভাস-গুলোকেই শুধু সাদা রং করে নিয়েছিলো, আজকাল আবার তার কাঠের ফ্রেমেও কেমন মেঘলা মেঘলা রং চাপিয়েছে। কৌটোভরা রং এনে, বুরুশ দিয়ে নিজেই করে এ সব। বুটিদার পর্দা দিয়েছে জানালায়। আর বিছানা কী? তোষক-গদিতে বেডকভারে সজ্জিত হয়ে যেন বারোমাসের বাসরঘর।

শুধু তাই নয়, নিজের ঘর ছাড়িয়ে ছোটো বৌ মাঝে মাঝে জা'য়েদের ঘরেও হানা দেয়, কেউ বলে না তবু দড়ির কাপড়-গুলো দোকানের মতো পাট পাট করে গুছোবে, মেঝের উপর ছড়ানো ছিটানো ছেলেমেয়েদের বইগুলো থাক ক'রে সাজিয়ে দেবে তাকের উপর, ছুটির দিন হ'লে, কারো অনুমতি না নিয়েই একটা তোষক বিছিয়ে রঙিন চাদরে ঢেকে দেবে চৌকিটাকে। লজ্জার লেশ নেই, ঘোমটার বালাই নেই, বড়ো বৌ মেজো বৌ বারণ করলে বলে, 'বা রে, আজ দাদাদের ছুটি না, দুপুরে শোবেন না ওঁরা? শুধু তক্তপোষে ঘুমুবেন নাকি?'

'ঘুমুক। তোর কী। তোর পিঠে তো আর ব্যথা লাগবে

না।' বলতে ইচ্ছে করে এসব, কিন্তু বলে না। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন চুপ করে যায়। না গিয়েই বা করে কী! শুধু তো ভাশুরদের জন্য বিছানাই পেতে দেয় না, ভাশুরদের এক পাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়েও কম পরিশ্রম করে না সে। নিজের হয়েছে একটি। তার সঙ্গে ধরে বেঁধে সব ক'টাকে খাওয়ায় দাওয়ায় জামা জুতো পরায়, শাসন করে, সেগুলোকে পড়তে বসানোই কি একটা সহজ ব্যাপার! আরো আছে। জায়েদের পান সেজে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, নোংরা থাকলে চ্যাঁচামেচি করে। কাজেই মুখে যতোই নিন্দে করুক, মনে মনে কোথায় যেন একটু সমর্থনও আছে। হয়তো তাই চুপ করে থাকে সব।

কিন্তু সবাই থাকলেও দারুকেশ্বর থাকবেন কেন? অনেক-বার অনেক ভাবে তিনি নিজের অসন্তোষ অসম্মতি এবং অপছন্দ জানিয়ে নানাভাবে শাসন করেছেন ছেলেকে। গম্ভীর থেকে বুঝতে দিয়েছেন রাগ, খারাপ ব্যবহার ক'রে বিরক্তি জানিয়েছেন। কিন্তু অবাধ্যতার স্পর্ধা তাতে এতোটুকু দমিত হয়নি সর্বেশ্বরের। বরং আর এক ধাপ উঁচুতে হাত বাড়িয়েছে, আরো বিলাসী হয়ে উঠেছে দিন দিন, স্ত্রীর আরো অনুগত।

এবার ক্রুদ্ধ দারুকেশ্বর একদিন ফেটে পড়লেন। কঠিন গলায় তীব্র হুঙ্কারে সমস্ত বাড়ির সব ক'টি লোককে কাঁপিয়ে জানিয়ে দিলেন, ভদ্রলোকের বাড়িতে এই সব কুৎসিত আচরণ করলে, বৌকে তো নিশ্চয়ই, দরকার হলে ছেলেকেও তিনি ঘাড় ধ'রে বার করে দেবেন।

বেলা ন'টা, তখনো বাড়ি থেকে বের হয়নি কেউ, বৌয়েরা

সব সংসারের কাজে ব্যস্ত, কর্মচারীরা দারুকেশ্বরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, রান্নার চাকর এইমাত্র বাজার এনে মসলা পিষতে বসেছে, নিবারণ কর্তাবাবুর প্রাতরাশের পরিত্যক্ত বাসন নিয়ে সবে উঠোনের কলে পা দিয়েছে, এই সময়ে এই।

দারুকেশ্বর রাশভারি মানুষ, তাঁকে এমনিতেই ভয় পায় সবাই, ইঙ্গিতেই সংসার চালান তিনি। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ ওঠে বসে। আজকের এই চিৎকার তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ছোটো বৌ সকালবেলা নিজে নিয়ে গিয়ে তার সাড়ে তিন বছরের ছেলেকে কোন এক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে এসেছে, যার মাইনে পুরো দশ টাকা। তু'একদিন আগে সর্বেশ্বর দারুকেশ্বরকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা বলেছিলো, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করেছিলেন দারুকেশ্বর। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'যা মাইনে দিই, তার জন্যই কৃতজ্ঞ বোধ করো।'

সর্বেশ্বর বলেছিলো, 'তা হ'লে আমাকে যদি প্র্যাক্‌টিস করবার জন্য নিয়মিত সময় দেন একটু, যাতে'—যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই বলেছিলো কিন্তু রেগে গেলেন দারুকেশ্বর—'নিয়মিত সময় বলতে তুমি কী বোঝো? কী চাও?'

'অন্তত কোর্টে যাতে রোজই ঘণ্টা কয়েকের জন্য একবার গিয়ে বসতে পারি, সিনিয়রদের কাছে একটু ঘোরাফেরা করতে পারি, বার লাইব্রেরিতে—'

'বেশতো, তাই করো না, পদত্যাগপত্র পেশ করো এখানে।'

'আপনি অকারণে রাগ করছেন।'

'আর তুমি খুব সংগত কারণে মাইনে বাড়াবার কথা বলতে এসেছ, না?'

'আমার চলছে না।'

'কী ক'রে চলবে, স্ত্রীকে যে স্ত্রীলোকের মতো তোয়াজ করে, পা-মোছা পাপোষকে যে গা-মোছা তোয়ালে বানায়—'

'বাবা!'

'আমি এই তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান ক'রে দিচ্ছি সর্বেশ্বর, এরপরেও যদি তুমি ঠিক পথে না চলো, আমার একটি কথা অমান্য করো—' বলতে বলতে তাকিয়ে দেখলেন সর্বেশ্বর কখন যেন চলে গেছে তাঁর কাছ থেকে।

এতোদূর আস্পর্ধা! তিনি কথা বলছেন, আর তা না শুনেই তাঁর ছেলে চলে যেতে পারলো ঘর ছেড়ে! রাগে অন্ধকার দেখলেন তিনি। শরীরে যেন আগুন ধ'রে গেল। তখুনি তাঁর চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো। নিজের শরীরের কথা ভেবে, বয়সের কথা ভেবে অতিকষ্টে দমন করলেন নিজেকে। সারারাত ঘুমুতে পারলেন না। আর তার প্রতিক্রিয়াতেই আজ সকালে উঠে এই।

২

বড়ো ছেলে রোহিতেশ্বরের দুই ছেলে এবং মেজ ছেলে মহেশ্বরের এক ছেলে—এই তিনজনও স্কুলে যায়। পাড়ার স্কুল, মাইনে মাত্র দু' টাকা, দুষ্টুমি করলে আচ্ছা ক'রে ঠেঙায়, দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত আটকে রাখে। মায়েরা তাইতেই সুখী। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা পড়াতে বসিয়ে ছোটো বৌ রাগ ক'রে বলে, 'গোয়ালখানায় দু'টাকা দিয়ে কি গরু হবার জন্যে ভর্তি করা হ'য়েছে?'

বড়ো বৌ মেজো বৌ রসিকতা ক'রে হাসে 'তা নেহাৎ মন্দ কী, গরু বানাতে পারলে কয়েক ফোঁটা দুধ তো অন্তত পাওয়া যাবে। এ বাড়িতে সাদা জিনিস কেউ চোখে দেখেছে?'

'লেখাপড়ার পাট নেই', ছোটো বৌর বিরক্তি কমে না, 'এদিকে মার খেয়ে খেয়ে বাচ্চাগুলোর পিঠের হাড় ভেঙে যাবার দশা। মাস্টারগুলো নেহাৎ অশিক্ষিত। বিড়ি ফোঁকে আর কী সব জঘন্য জঘন্য কথা শেখায়। এ সব কুশিক্ষা কি শিশুদের পক্ষে ভালো?'

শুয়ে ব'সে আলস্য করতে করতে জা'য়েরা আবার হাসে, 'ঐ মরা বলতে বলতেই রাম রাম শিখে ফেলবে, তোকে অত ভাবতে হবে না।'

কী আর বলবে ছোটো বৌ। বলবার আছে বা কী? যার যার পাঁঠা তারাই যদি ল্যাজে কাটে, অন্যের হাজার মাথা ব্যথাতেও প্রতিকার হবে না কোনো। কিন্তু তাই ব'লে নিজের ছেলেকে সে এভাবে মানুষ করতে পারে না। একটা শিশু মানুষ করার অনেক দায়িত্ব, অনেক আয়োজন, সুতরাং নিজের ছেলেকে সে মূল্য বেশী হ'লেও স্কুলে না দিয়ে পারলো না। আর এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে যে দারুকেশ্বর এমন অসংগত রকমের ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, এটা কল্পনাও করেনি সে। যাবার আগে ছেলেকে জামা জুতো পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তার দাদুর ঘরে প্রণাম করাতে, ঘরে অনেক লোক-জন ছিলো তাই ব'লেই চলে যেতে হয়েছে। ফিরে এসেছে এই মাত্র, আসা মাত্রই দারুকেশ্বরের বজ্রের মতো গলা শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘরে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছিলো সর্বেশ্বর, বাবার গর্জন শুনে,

তোয়ালেতে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। 'আমাকে বলছেন ?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই তোমাকে। তুমি ছাড়া এতোবড়ো কুলাংগার আর কে আছে এ বাড়িতে যে পুরুষ একটা মেয়ে-মানুষের ভেড়া।'

নীল হ'য়ে উঠলো সর্বেশ্বরের মুখ।

'মনে রেখো এটা বাজার নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি, বৌকে ব'লে দিও, বৈঠকখানা সাজাতে হ'লে এ পাড়ায় চলবে না। বাপের বাড়ির দেশে গিয়ে যেন সাজায়।'

'এসব আপনি কী বলছেন ?' জীবনে এই প্রথম বাপের দিকে মুখ তুলে চোখে চোখে তাকিয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গি করলো সর্বেশ্বর, 'আমি আপনার ছেলে, আমার সম্পর্কে আপনি যা খুশি তা বলতে পারলেও, অন্য একজন মেয়ে সম্পর্কে এরকম বলা আপনার উচিত নয়।'

'রেখে দাও তোমার উচিত অনুচিত। যা সত্য তাই বলছি। আমার বাড়িতে থাকতে হ'লে, আমার ভাত খেতে হ'লে প্রত্যেক নিঃশ্বাসে আমার কথা মতো চলতে হবে। পারো, ভাল। না পারো, বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

'তাই যাবো।' সর্বেশ্বরের গলায় স্বর অনমনীয় হ'লো।

'এখুনি, এখুনি বেরোও', দারুকেশ্বর প্রচণ্ড হ'লেন 'আর এক দণ্ড আমি তোমাদের বাড়িতে দাঁড়াতে দেবো না।'

'ভাতটা আপনার, বাড়িটা আপনার নয়। বাড়ি আমি আমার সুবিধে মতো ছাড়বো, কিন্তু আপনার ভাত আর খাবো না।'

'কী ? কী বললে ? বাড়ি আমার নয় ?'

'না। এ বাড়ির ভাড়াটে হিসেবে আপনার যতো অধিকার আমারো ঠিক তাই।'

'বদমাস!' ছুটে ছেলের মুখোমুখি এসে তর্জনী তুললেন, 'এতো বড়ো স্পর্ধা হ'য়েছে তোর! আমার মুখে মুখে দাঁড়িয়ে তুই বলতে সাহস পাস যে এ বাড়ি আমার নয়? তবে কার রে হারামজাদা! ভাড়াটা কি তুই দিস? বাড়ি কি তোর নামে নেওয়া হ'য়েছে?'

'আমি উকিল, আইনের প্যাঁচে রাতকে দিন করতে পারি, দিনকে রাত করতে পারি। সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ধর্ম, বিবেক সে সব আমি আপনার জন্য-অনেকবার বিসর্জন দিয়েছি, দরকার হ'লে শেষ বারের মতো নিজের জন্যও একবার দেবো।'

ব'লে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না সর্বেশ্বর, উঠোন পেরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, আর ক্রুদ্ধ দারুকেশ্বর সেদিকে তাকিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ছেলেকে এমন সব ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন, যে সব ভাষা কোনো অভিধানে নেই। কোনো বস্তির নিম্নতম বাসিন্দাও যে ভাষা উচ্চারণ করতে একটু দ্বিধা করে। শুধু তাই নয়, তক্ষুনি বড়ো ছেলেকে পাঠিয়ে উকিল ডাকিয়ে আনলেন, উইল ক'রে সম্পত্তি থেকে সর্বেশ্বরকে বঞ্চিত করবেন বলে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে এই কুলাংগার একটি কপর্দকও না পেতে পারে। আর মাসোহারার কোনো প্রশ্নই রইলো না।

এই সব ব্যাপার দেখে ছোটো বৌ কম্পিত পায়ে নিজের ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কতোক্ষণ, তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানালার কাছে এসে শূন্য মনে তাকিয়ে

রইলো বেলা দশটার আকাশের দিকে। বৈশাখ মাস, একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে লঘু গতিতে, হয়তো ঝড় উঠবে, হয়তো বৃষ্টি নামবে—নামুক, নামুক। সারা পৃথিবীটা ছেয়ে যাক মেঘে, ভেসে যাক বৃষ্টিতে।

কিন্তু তা যাবে না। এমনি ক'রেই আরো অনেক, অনেকদিন বেঁচে থাকতে হ'বে এই সংসারে, এই বাড়িতে। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতোটুকু বদলাবেন না, এতোটুকু জায়গাও ছেড়ে দেবেন না তাঁর কর্তৃত্বের অদম্য স্পৃহা থেকে। না, একটু ভুল ভেবেছে ছোটো বৌ। এ বাড়িতে আর তো জায়গা নেই তাদের জন্য। তার জন্যেই আজ এই জায়গা বেদখল হ'য়ে গেছে। এ বাড়ির সঙ্গে সর্বেশ্বরকে আজ শুধু তার জন্যই বিচ্ছিন্ন হ'তে হ'য়েছে। সত্যি কি এখন চলে যেতে হবে! কোথায় যাবে? গেলে চলবে কেমন ক'রে? খাবে কী? বাড়ি ভাড়া দেবে কী দিয়ে? এই তো মাসের মাত্র মাঝামাঝি, এরই মধ্যে হাত খালি হ'য়ে এসেছে। তার উপরে ছেলেকে ভর্তি করতে আজ কতো টাকা বেরিয়ে গেল। কে জানতো এমন হবে, এমন ক'রে কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দেবেন আপন সন্তানকে।

এদিকে মাসখানেক যাবত কী যে হ'য়েছে সর্বেশ্বরের, মাঝে মাঝেই পেটের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা হয়, ছটফট করে বিছানায় শুয়ে, দাঁতে দাঁত লেগে যায় ব্যথায়। ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসতে হয়, ভিজিট দিতে হয়, দামী দামী ওষুধ কিনতে হয়। কোনো ডাক্তার কখনো বলেন কলিক, কখনো লিভার, কখনো বিকোলাই, এখন এক্সরে করিয়ে নিতে বলছেন। শুধু তাই নয়, ডায়েটেরও চার্ট ক'রে দিয়েছেন তিনি। এই সব বিপদে আপদে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সাহায্য করেন দারুকেশ্বর।

তিনবার হাত পাতলে একবার অন্তত হাত বাক্সের ডালা তিনি খুলে ধরেন। এক আধবার কুশল প্রশ্নও যে জিজ্ঞাসা না করেন তাও নয়।

আগে আগে চাইতে বড়ো লজ্জা করতো, অভিমান হ'তো, অবাকও লাগতো এরকম অদ্ভুত ব্যবহারে, কিন্তু কালক্রমে সবই সয়ে এসেছে। শুধু অভিমানটাই গিয়েও যেতে চায় না। কখনো কখনো মনে হয়, যা হয় হোক, শ্বশুরের দরজায় গিয়ে আর প্রার্থী হ'য়ে যেন দাঁড়াতে না হয়। হয়তো ঈশ্বর এতোদিনে সেই আবেদন নিবেদনে কান দিয়েই এমন একটি ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন। নইলে পিতা হ'য়ে পুত্রের সঙ্গে কেন দারুকেশ্বর এমন ব্যবহার করবেন! কেউ করে কখনো। কেমন ক'রে তিনি ঐ সব কুৎসিত কথা উচ্চারণ করতে পারলেন? বাড়িভর্তি লোকের সামনে অমন অকাতরে নিজের পুত্রবধূর নামে আর কোন শ্বশুর এই রকম অভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন? কী আশ্চর্য, নিজের বাসগৃহ সাজানো পাপ? অন্যায়? অসৎচরিত্র স্ত্রীলোকের নিদর্শন? ছি! ছি, ছি। কী নোংরা। কী নোংরা। যে ঘরে মানুষ বাস করবে, সে ঘর সে গুছিয়ে নেবে না মনোমতো ক'রে? চোখের একটা দাবী আছে না? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা একটা অশ্লীলতার পরিচয় এমন কথা কে কবে শুনেছে? এমন কোন ভদ্রবাড়ি আছে যেখানে এরচেয়ে অন্যরকম থাকে।

যে ঘরটায় দারুকেশ্বর নিজে থাকেন—ঘরটা বেশ। আলো হাওয়া আছে। কিন্তু জানলা দরজা বন্ধ রেখে, ময়লা বিছানায় চিটচিটে কাপড় জামায় নোংরা মেঝেতে কী ভাবে থাকতেন সারাদিন। কী ভাপ্‌সা গন্ধ বেরুতো! একদিন সে ঘর ধুয়ে মুছে ফিটফাট ক'রে দিয়েছিলো। বুড়ো মানুষ নিজে

কিছুই পারেন না, স্ত্রী নেই ; কে ক'রে দেয়। তাই মানুষটিকে সেবা করতে ভালো লাগতো ছোটো বৌর আর কর্তব্য ব'লে মনে হ'তো। বুঝি বা একটু মমতাও হ'তো। শরীর অসুস্থ হ'লে যখন দিন রাত শুধু ঐ তক্তপোশটায় শক্ত কাঠের উপর শুয়ে থাকতেন, যেন তার নিজের পিঠে লাগতো। দারুকেশ্বরের সেই শুধু তক্তপোশের উপর যদিও নিজের একটা তোষক ছিলো, (কোনো পুরোনো জিনিসের প্রদর্শনী হ'লে সেই তোষকটা নিশ্চয়ই ফার্স্ট প্রাইজ পেতো।) সেটার তুলোগুলো তুলো ছিলো না, বয়সের চাপে অন্য কোনো কঠিন বস্তুতে পরিণত হ'য়েছিলো। উপরের কাপড়টার রেশ মাত্র ছিলো। ছোটো বৌর সন্দেহ হ'য়েছিলো, এ তোষকটা বোধহয় দারুকেশ্বরের বিবাহের তোষক। কারো অনুমতি না নিয়েই নিবারণকে দিয়ে সেটাকে ডাস্টবিনে চালান করেছিলো ছোটো বৌ তারপর নিজের বিয়ের নতুন তোষকটা এনে পেতে দিয়ে বলেছিলো, 'এরপরে আর কিন্তু আপনি কখনো শক্ত তক্তপোশে শুতে পারবেন না, এটা পাতাই থাকবে।' কই তখন তো কোনো আপত্তি করেন নি, বা রাগ করেন নি। নিজের তোষকটা শ্বশুরকে দিয়ে কয়েকদিন শুতে খুব কষ্ট হ'য়েছে তার, সর্বেশ্বরের বিয়ের আগের চেপ্টে যাওয়া পুরোনো জিরজিরে, ডিমওঠা, বিচিভরা তোষকটাকে পিঠের তলায় অভ্যেস করে নিতে রীতিমতো অসুবিধে হ'য়েছে। বুঝতে পেরে সর্বেশ্বর কিছু না ব'লে কোর্ট থেকে ফেরবার পথে আর একটা নতুন তোষক কিনে নিয়ে এসেছে একদিন।

ঘর অপরিষ্কার থাকলে, আজকাল দারুকেশ্বর রীতিমতো রাগ করেন, দড়িতে ঝোলানো ময়লা কাপড়ের স্তূপ দেখলে

নিবারণকে বকেন। ছোটো বৌ এমন কথাও বলতে শুনেছে তাঁকে, যা শুনে ছোটো বৌর মনে হ'য়েছে, এই সব ছোট-খাটো সুখসুবিধার কাজগুলো নিবারণের হাতে ছেড়ে না দিয়ে তিনি যেন তাকে করতেই ইঙ্গিত করছেন। খুশি হ'য়েছে সে, মনে মনে ভেবেছে, যাক্, আস্তে আস্তে অভ্যেস বদলাচ্ছে তা হ'লে এমনও আশা করা যায়, যে একদিন বাড়িটা সত্যিই একটু ভদ্র হ'য়ে উঠবে, অন্তত এই শুয়োরের জীবন যাপনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার কথাটা চিন্তা করতে শিখবে।

এই নাকি তার পরিণাম!

৩

কিন্তু সর্বেশ্বর কোথায় গেল? কেন গেল? কেন এখনো ফিরছে না। কী হ'লো তার? জানালা ছেড়ে দ্রুতপায়ে ছোটো বৌ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

দরজার বাইরে দুই চাকর দাঁড়িয়ে জটলা করছে তাদের নিয়ে। চোখ বড়ো ক'রে গলা ছোটো ক'রে দু'জন দু'জনের (একজন ছোটো বৌ আর একজন দারুকেশ্বর) পক্ষ নিয়ে নানা তথ্যের অবতারণা ক'রে এ ওকে হারিয়ে দেবার চেষ্টায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। এক পলক দেখেই দরজার আধখোলা পাল্লাটা ছোটো বৌ আবার ভেজিয়ে দিল। পারিবারিক কলহে এদের উৎসাহটাই সর্বদা টগবগ করে বেশী। অনেক খোরাক পায় এরা। অনেকদিন ধরে আলাপ আলোচনা চালিয়ে জিইয়ে রাখে কেচ্ছাটি। জিভের ব্যায়াম করে। তবু এরা ক্ষমার যোগ্য। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আর কী জানে বেচারারা। পৃথিবীর

কতোটুকু খবর এসে তাদের কানে পৌঁছয়। কাজেই যে বাড়িতে বাস করে সেই চারদেয়ালের ভিতরটুকুতে উত্তেজক কিছু ঘটলে ঘোলা জলে আলোড়ন ওঠে, জীবনের একটা মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু শুধু কি ওরাই? এ বাড়ির আর দু'খানা ঘরেও কি এই আলোড়ন কিছু সুখ আনেনি? উৎসাহিত হবার মতো কোনো বক্তব্য আনেনি? এনেছে। ছোটো বৌ জানে এনেছে।

ছোটো বৌ দরজার কাছ থেকে সরে আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

বেলা প্রায় বারোটার সময় চাল ডাল তেল নুন, হাঁড়িকুড়ির নতুন সংসার নিয়ে ফিরে এলো সর্বেশ্বর। এসে দেখলো, ছেলে ঘুমিয়ে রয়েছে, আর ছেলের মা শুকনো মুখে বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।

'কী ভাবছো এতো?' সর্বেশ্বর গলায় স্বাভাবিক সুর আনতে চেষ্টা করলো। চোখ সজল হ'য়ে উঠলো ছোটো বৌর।

হাসিমুখে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—'সব নিয়ে এসেছি আমি। এই তো ভালো হ'লো, এতোদিনে স্বাধীন হতে পারলাম, একটা মানুষের জীবন পেলাম। তুমি গুছিয়ে নাও, রান্নার জোগাড় করো। মাত্র তো আড়াই জন মানুষ, রান্না করতে খুব কষ্ট হবে তোমার?'

ছোটো বৌ মুখ নিচু ক'রে চুপ করে রইলো।

সর্বেশ্বর তার কাছে এসে পিঠে হাত রাখলো, 'আপাতত এখানেই দু' একটা মাস কাটাতে হবে, উপায় তো নেই, চট ক'রে কি নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী ভাড়ার বাড়ি পাওয়া যাবে

এখন ? কাজেই এখানেই মানিয়ে নাও, মন ঠিক ক'রে নাও। আর তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এতো অযোগ্য ভাবো না যে, বাপ খেতে না দিলেই পথে দাঁড়াবো, স্ত্রী আর সন্তানের ভরণপোষণ করতে পারবো না।' বলতে বলতে স্ত্রীকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিল, 'মানুষ হবার মন্ত্র তো তুমিই আমাকে দিয়েছ, এখন তুমিই আবার মুখ ভার ক'রে থাকবে ?'

এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো ছোটো বৌর।

মা বাবা না থাকলেও ছোটো বৌ তার দাদা বৌদির ভালো-বাসায় কোনোদিনই তাঁদের অভাব অনুভব করতে পারে নি। দাদা নিজে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো ক'রে তুলেছেন, বৌদি নিজের গয়না বেচে তার বিয়ে দিয়েছেন। এক কালে ধনী ব'লে খ্যাতি থাকলেও পূর্বপুরুষের বিত্ত নিয়ে খুব বেশী আরামে বসে শুয়ে দিন কাটেনি দাদার। সে বড়ো হ'তে হ'তে আর দাদা বৌদির বয়স বাড়তে বাড়তে সবই প্রায় ক্ষয়ে এসেছিলো। তাদের পারিবারিক চাল চলনের পক্ষে সে প্রায় একটা ফুৎকাব। ঢাকা সহবে মস্ত একখানা বাড়ি তখনো টিঁকে ছিলো, ভাড়া পাওয়া যেতো, কিছু ধানের জমি ছিলো, ঘর কয়েক প্রজা ছিলো, এই সম্বল। তার বিয়েতে কী ক'রে যে দাদা অতগুলো টাকা দিতে পেরেছিলেন এখনো ভেবে পায় না সে। সে বারণ করেছিলো। এতো যাদের টাকার খাঁই সেখানে বিয়ের কথা ভাবতে অপমানিত বোধ করেছিলো। কান্নাকাটিও করেছিলো বৌদির কাছে। ওঁরা শোনেন নি। পাত্র উকিল, ভাইরা ইঞ্জিনিয়ার একটি মাত্র বোন বিবাহিত,

বাপের অতগুলো বাড়ি, বস্তি, লাখ টাকার কারবার এই শুনেই কোনোদিকে তাকালেন না। বললেন, 'গরীবের বোন হ'তে পারো, মেয়ে তো বড়োলোকেরই। ছিলো তো সবই, এখন শুধু হাতটা বড়ো আছে আর কিছুই নেই। এক অভাব থেকে আর তোমাকে আমি আর এক অভাবে ঠেলে দেবো না। তাতে আমার জমি বন্ধক পড়ুক বা বাড়ি বিক্রী হোক, এই রকম বড়োলোকের ঘরেই বিয়ে দেবো তোমাকে।' তবুও সে একটা অস্ফুট তর্ক তুলতে চেয়েছিলো থামিয়ে দিয়েছেন দাদা, যুক্তি দেখিয়েছেন, 'সব রকম একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বড়োলোকের ছেলেরা অনেক সময়েই লেখাপড়ায় মূর্খ থাকে, এ একেবারে সোনায় সোহাগা। তাছাড়া আমার কি আর মেয়ে আছে?'

হায় রে! কী বিশ্বাসেই কয়েকখানা চিঠির উপর নির্ভর ক'রে বড়ো ঘরে বোনকে বিয়ে দিলেন দাদা! এই নাকি বড়ো ঘর! এই নাকি চাল-চলন। বৌ হ'য়ে বাড়িতে ঢুকে ছোটো বৌ সব দেখে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। আর দাদার মুখে মেঘের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো। চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিলো কপালে। যাবার সময় ঢোক গিলে বলেছিলেন, 'অন্যের কথার উপর নির্ভর ক'রে কী করলাম! কী হবে, কেমন হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নত মুখে ছোটো বৌ জবাব দিয়েছিলো, 'তুমি কিছু ভেবো না দাদা, এঁরা লোক খুব ভালো।'

'ভালো?'

'বাড়িটাতে অনেকদিন কোনো মেয়ে ছিলো না কিনা, তাই

একটু বিশৃঙ্খল,' দাদাকে যে কী কৈফিয়ৎ দেবে ভেবে পায় নি, চুপ ক'রে থেকে আবার বলেছে, 'কিন্তু খুব ভালো সবাই, আমার খুব ভালো লেগেছে।'

মাথায় হাত রেখে বোনের অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন দাদা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'কী জানি।' চোখ মুছে বলেছেন, 'তুই আমাকে চিঠিতে সব খুলে লিখিস।' ছোটো বৌ কান্না চেপে বলেছে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে দাদা! আমি সব ঠিক ক'রে নেবো।'

সত্যিই সব ঠিক ক'রে নিতে পেরেছে কি পারেনি, আজ আর তার হিসেব মিলোলো না ছোটো বৌ। বড়োলোক শ্বশুরের বড়ো ঘরে পা দিয়ে, শুভদৃষ্টির সময়ে শ্বশুরের পুত্রের দিকে তাকিয়ে সেদিন হতাশার যে গভীব অন্ধকারে প্রায় তলিয়ে গিয়েছিলো সে, আজ পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত দরিদ্র স্বামীর দিকে তাকিযে সব দুঃখ তার সার্থক হ'যে গেল। সব বেদনা সার্থক হলো। অকৃত্রিম আনন্দে আলো হ'য়ে উঠলো পৃথিবী। নতুন উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো সে, নতুন সংসার রচনায মন দিল। তাদের স্বামী স্ত্রীর একক সংসার, সুখের সংসার।

৩

কিন্তু কী ছোটো ঘর! কী যে অসুবিধে হ'তে লাগলো বলা যায না। একটা বাবান্দাকে ঘর বানালে বারান্দার আকৃতিও স্পষ্ট হয় না, ঘরের আকৃতিও স্পষ্ট হয় না। কোনো রকমে শোয়া বসা চললেও গোটা সংসারকে সেখানে ধরানো প্রায় একটা অলৌকিক

ব্যাপার ব'লেই মনে হ'লো ছোটো বৌর। এদিকে খাট চৌকি ওদিকে আলনা আলমারী তার উপরে হাঁড়িকুঁড়ি উনুন। আর তারও উপরে একটি শিশু। ছোটো বৌ ভেবে অস্থির হ'য়ে গেল কী উপায়ে এই একফোঁটা চৌকো জায়গাকে সে এতো রকম কাজে ব্যবহার করবে। যতো ছোটো সংসারই হোক, তার আয়োজন কিছু কম নয়। থালা, বাটি, গ্লাস, প্লেট, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, জিরে—কী বাদ দেয়া যায়? বেশী লোকের পরিমাণ বেশী, কম লোকের পরিমাণ কম, এ ছাড়া এই তালিকায় আর কিছুরই প্রভেদ নেই। ওদিকের রান্না ঘরে, অর্থাৎ দারুকেশ্বর আর দারুকেশ্বরের অন্য দুই ছেলের সংসারেও যা যা দরকার, ছোটো বৌর একক সংসারেও ঠিক তাই প্রয়োজন।

দেয়ালগুলো ক্যানভাসের উনুন ধরালে আর টেঁকা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তেতে ওঠে। সর্বেশ্বর স্টোভ নিয়ে এসে তবু একটু রক্ষা করলো। অনেক ভেবে চিন্তে রাস্তা থেকে এক মিস্ত্রি ধ'রে নিয়ে এলো ছোটো বৌ। বারান্দার পশ্চিম দিকে কর্পোরেশনের নিয়ম মাফিক যে চার ফুট জায়গা ছেড়ে রাখা ছিলো, সেদিকের ক্যানভাসটা কাটিয়ে নিল তাকে দিয়ে, তারপর কাঠের ফ্রেম দিয়ে এদিকের মতো আর একটা দরজা বসিয়ে দিল। অনেকটা খোলা মেলা হ'য়ে গেল ঘরটা। বাড়ির ভিতর দিকে ঠিক ঐ দরজারই মুখোমুখি দরজাটা। ঝগড়াঝাঁটির পরে প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই বন্ধ ক'রে রাখতে হ'তো। নিতান্ত বেরুতে হ'লে, জল আনতে হ'লে অথবা বাথরুমে যাওয়া ছাড়া খুলতোই না ছোটো বৌ। তার লজ্জা করতো, ভয় করতো, সঙ্কোচ হ'তো। ঠিক পাশের কোনাচে ঘরটিই দারুকেশ্বরের, খুললেই চোখোচোখি হ'য়ে যাবার আশঙ্কা, আর

চোখোচোখি হ'লেই তিনি সবেগে মুখ ঘুরিয়ে ঠাস ক'রে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতেন। সেটা সহ্য হ'তো না কারো। ছোটো বৌরও না, সর্বেশ্বরেরও না। সর্বেশ্বর বলতো না কিছু, কিন্তু ছোটো বৌ জানতো জানালার শব্দটা ঠিক এসে বুকে বাজবে তার, যন্ত্রণায় সে চোখ বুজবে। সেজন্য আরো সাবধান হ'য়ে থাকতো সে। এদিকের দরজা ফুটিয়ে যেন হাঁফ ছাড়লো একটু। শুধু তাই নয়, চার ফুট গলিটুকুকেও সে পরিষ্কার ক'রে লেপে পুঁছে সুন্দর একটু আঙিনা ক'রে নিল। দরজার কাছে কেরোসিন কাঠের বাক্স রেখে এক ধাপ সিঁড়ি বানালো, সীমানার দেয়ালের সঙ্গে আর ঘরের দেয়ালের মাথায় ঢালু বেড়া দিয়ে ছোট্ট একচালা ঘরের মতো সেড ক'রে নিল একটু, আর সেটুকুই হ'লো তার রান্নাঘর। বৃষ্টি হ'লেই যা মুস্কিল, নইলে নিতান্ত মন্দ হ'লো না। পোড়া মাটির ছোটো ছোটো ঘটি বাটি এনে গুছিয়ে রাখলো মশলাপাতি। বৈয়ম এনে চা চিনি চিঁড়ে গুড় সাজালো। খাটের তলাটা ইট দিয়ে উঁচু ক'রে ভাড়ার ঘর বানালো। এ ভাবে চালাতে চালাতেই প্রাণপণে বাড়ি খুঁজতে লাগলো সর্বেশ্বর। সারা পাড়া চষে ফেললো সে, কিন্তু কোথায় বাড়ি! তার মতো স্বল্প আয়ের গৃহস্থের জন্য কোথাও কিছু নেই। এতোদিনে সর্বেশ্বর বুঝতে পারলো কলকাতা সহর কী ভীষণ জায়গা!

এক পলকের নোটিশে বাপ তাকে চাকরী ছাড়িয়ে আলাদা ক'রে দিতে পেরেছেন বটে কিন্তু ওকালতির আয় নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ এতোটা বেশী হ'য়ে ওঠেনি যার উপর নির্ভর ক'রে স্ত্রী আর ছেলের হাত ধ'রে সে যে কোনো ভাড়ার একটি বাড়িতে গিয়ে অনায়াসে উঠতে পারে।

প্রায় সাত বছর হ'য়ে গেল আইন পাশ করেছে সর্বেশ্বর, তারপরেই তো বাঁধা মাইনেতে ঢুকেছে নিজেদের কারবারে। এখন নতুন ক'রে পসার জমানো প্রায় পাহাড় ডিঙোনোর মতোই কঠিন এই বাজারে, একমাত্র উপায় আবার আর কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি এই রকমই কোন চাকরী পাওয়া যায়। তার মতো মানুষের পক্ষে সেটাই ভালো, সেটাই নির্ঝঞ্ঝাট।

মাত্র দু'মাসের আলাদা সংসারেই বেশ কিছু ধার দেনা হ'য়ে গেল। নতুন সংসার পাতার আয়োজনে যা খরচ হ'লো দেখা গেল তার সংখ্যা খুব কিছু কম নয়। জামাকাপড় কম পরা যায়, কিন্তু পেটটাকে তো অল্প দিয়ে ভরানো যায় না। সামান্য ডাল তরকারী ভাত জোটানোও মন্দ শক্ত কর্ম ব'লে মনে হ'লো না সর্বেশ্বরের। একটা ছোটো শিশু আছে, একটু দুধ লাগে তার, নিজের শরীরটা কিছুকাল যাবৎ যথেষ্ট শত্রুতা করছে, একটা আধটা ওষুধও কিনতে হয়! সারাদিন আলিপুরে কালো কোট গায়ে দিয়ে মাকড়সার পোকা ধরার মতো মক্কেল ধরার কাজে হা পিত্যেশ ক'রে পরিশ্রম যতোটা হয়, লাভ ততোটা হয় না।

তার উপরে দারুকেশ্বর বাড়ি ভাড়ার জন্য এক জরুরী নোটিশ পাঠালেন এবং সেই নোটিশটি পাঠ ক'রে সর্বেশ্বর হতচকিত হ'লো। স্বামীর হতাশাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটো বৌ বললো, 'ভাবছো কেন, যদি কিছু সামান্য ভাড়া দিলে উনি চুপচাপ থাকেন, না হয় তা' দেওয়া যাবে। সারাবাড়ির ভাড়াই তো তেতাল্লিশ টাকা, এই বারান্দাটুকুর জন্য আর উনি কতো নিতে পারেন।

সর্বেশ্বর শিথিল হাতে নোটিশটি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল। দারুকেশ্বর জানিয়েছেন এই ঘরখানার ভাড়া একশো টাকা হওয়া উচিত, কেননা, আজকাল তিন ঘরের ফ্ল্যাট তিনশো, অতএব এক ঘর একশো। সোজা হিসেব। কিন্তু রান্নাঘর, বাথরুম কমন বলে তিনি ততোটা নেবেন না, নব্বুই ক'রে দিতে হবে। দু'মাসের বাকি একশো আশী টাকা এবং এই মাসের এ্যাডভান্স নব্বুই, সবসুদ্ধ দুশো সত্তর টাকা তিনি এই মুহূর্তেই দাবী করছেন। আর তা না দিতে পারলে সাতদিনের মধ্যে চলে যেতে বলেছেন। ছোট বৌ স্তব্ধ হ'লো।

পরের দিন দুপুর বেলা সর্বেশ্বর কোর্টে বেরিয়ে গেলে, মহেশ্বর, রোহিতেশ্বর কাজে বেরুলে, তাদের স্ত্রীরা খেয়েদেয়ে যার যার ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুতে গেলে নিরালা নির্জন বুঝে ছোট বৌ এসে শ্বশুরের ঘরে দাঁড়ালো।

'একটা কথা আছে!'

দারুকেশ্বর হিসেব লিখছিলেন, প্রায় চমকে উঠে ফিরে তাকালেন।

পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনো কথা নেই।'

'আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে।'

'আমি কাজ করছি, শোনবার সময় নেই।'

'আমি ব'লে যাবো, শোনা না শোনা আপনার ইচ্ছে।'

'এখন যাও।'

'যাবো, কিন্তু যা বলতে এসেছি তা না ব'লে যাবো না।'

'কী বলতে এসেছো?'

‘আপনি ওরকম একটা অসংগত ভাড়া চেয়েছেন কেন ?’

‘না দিলে সাবলেট করবো ব’লে।’

‘তা ব’লে যা অন্যায় যা অসম্ভব—’

‘চুপ করো।’

‘আপনি জানেন, কী কষ্টে আমাদের দিন চলছে ?’

‘জানতে চাই না।’

‘অত ভাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।’

‘আমি তো জোর করছি না। যেখানে সস্তা পাবে চলে যাও সেখানে।’

‘সস্তাতেও এখন যেতে পারি না। এখন, এই মুহূর্তে বাড়ি ভাড়া দেবারই সামর্থ্য নেই আমাদের। এ বাড়ির ভাড়াও দিতে পারবো না। যখন পারব,—’

‘যখন পারবে তখনই তা হ’লে থেকো।’

‘আর এখন ?’

‘এখন ভাড়া দিলে তবেই থাকা হবে নচেৎ নয়।’

‘রাস্তায় বার ক’রে দেবেন ?’

‘অবাধ্য সন্তানকে তার চেয়েও কঠিন সাজা দিতে আমি প্রস্তুত।’

‘কিন্তু আমি তো আপনাব সন্তান নই, আমার ছেলেও আপনার সন্তান নয, আমাদের কী কববেন ?’

এ জবাব আশা কবেন নি দারুকেশ্বর, একটু থমকালেন, পরমুহূর্তে—ডেস্কটা ঠেলে দিযে বললেন, ‘আমি বলছি তুমি এখন যাও।’

‘শুনলাম উইল ক’রে ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত কবেছেন, কেন ? সেটা কি আপনার উচিত হয়েছে ?’ ছোটো বৌ নিষ্কম্প।

'বেয়াদপি কোরো না।'

'আপনার ছেলে অসুস্থ, ডাক্তার তাকে বিশ্রামে থাকতে বলেছেন, ভালো খেতে বলেছেন, চিন্তা করতে বারণ করেছেন, আপনার ভাবনা হয় না তাঁর জন্য ?'

'না।'

'আপনি মনে মনে ভাবেন না, যা করছেন তা আপনার ঠিক হচ্ছে না।'

'বলছি, তুমি যাও।'

'আপনি আমাদের বাবা, সবচেয়ে বড়ো গুরুজন, বড়ো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমি সেই দোহাই দিয়ে আপনাকে বলছি, আপনি আপনার সন্তানের আয়ুর দিকে তাকিয়ে এতো নিষ্ঠুর হবেন না।'

'তবু তুমি তর্ক করছো ?'

'যদি অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষমা করুন, সমস্ত শাস্তি আপনি আমাকে দিন, কিন্তু—'

'ওসব থিয়েটারি ঢং এ বাড়িতে চলবে না।'

'আমি বলছি আপনাকে, এই মুহূর্তে আমরা নানা রকম অভাবে—'

'য্ যাও।' প্রচণ্ড গর্জনে প্রায় লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়লেন দারুকেশ্বর। কেঁপে উঠে থেমে গেল ছোটো বৌ। দারুকেশ্বর আঙুল দিয়ে তাকে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

ছোটো বৌ সন্তানসম্ভবা, রীতিমতো ভারি মাস। ঘরে এসে কতোক্ষণ পর্যন্ত যেন নিঃশ্বাস নিতে পারলো না। এবার অসম্ভব শরীর খারাপ হ'য়েছে তার। রাত্রে ঘুম হয় না, খিদে হয় না, খেলে হজম হয় না। সর্বেশ্বর চিন্তা করবে ব'লে সর্বদাই দেহের সমস্ত কষ্ট সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু যতোই রাখুক, সময় তো

হ'য়ে এলো। একটা ব্যবস্থা তো আছেই সন্তানের জন্মের সময়ে, চিন্তাও আছে। সর্বেশ্বরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কথা ভেবে কাল সারারাত ছোটো বৌ ছটফট করেছে, অশান্তি ভোগ করেছে, তখন থেকেই মনে মনে স্থির করেছিলো একবার গিয়ে সে দারুকেশ্বরের কাছে দাঁড়াবে, দারুকেশ্বর তার পিতৃস্থানীয়, তাঁর কাছে কিসের অভিমান, কিসের লজ্জা! সত্যি বলতে রাগের কারণটা তো সেই-ই, তার আচরণই তো দারুকেশ্বরকে ক্ষিপ্ত করেছে? না হয় সেখানে সে নতি স্বীকারই করলো। যদি সর্বেশ্বরের শান্তি হয়, তার জন্য এটুকু কি খুব বেশী?

কিন্তু যা হবার নয় তা হয় না। যার ভিতরে যা নেই তা আশা করা বোকামি। ব'সে থাকতে থাকতে হঠাৎ ছোটো বৌ শক্ত পায়ে শক্ত মুখে উঠে দাঁড়ালো, ঘুরিয়ে প'রে নিল শাড়িটা, মাথাটা আঁচড়ে নিল, তারপর ঘুমন্ত ছেলেকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, কয়েক পা হেঁটে তবে বড়ো রাস্তার মোড়, মোড়ের মাথায়ই এক স্যাক্‌রার দোকান। এদিক ওদিক তাকিয়ে সেখানেই ঢুকলো সে, হাত থেকে খুলে রাখা দশগাছা চুড়ির ছ'গাছা ব্যাগ থেকে বার ক'রে বিক্রী করলো মাপিয়ে। পুরোনো দিনের গড়ানো চুড়ি, ওজন আছে বেশ। ছ'গাছা চুড়ির সোনার বিনিময়ে মোট পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা চোদ্দো আনা হাতে এলো তার। আর দাঁড়ালো না। একটু এগিয়ে পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার নীলমাধব সেনকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বলে ফিরে এলো বাড়ি।

পাড়ায় নীলমাধব সেনের খ্যাতি আছে ডাক্তারিতে, রীতি-

মতো সম্মানিত ব্যক্তি। আর ভিজিটটাও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য রকমের বেশী। তাঁর চলনে বলনে পোষাকে সর্বত্রই লেখা আছে সে কথা। যে কোনো বাড়িতেই তাঁকে কল দেয়া মানে বেশ বিশেষ অবস্থা বলে ধ'রে নিতে হয়। দারুকেশ্বরের গৃহেও এই তাঁর প্রথম পদার্পণ নয়। দারুকেশ্বরের রক্তের চাপ যখন তাঁকে চেতনাহীন ক'রে ফেলে, ছেলেরা তখন উপায়হীন হ'য়ে বেশী ভিজিট দিয়ে নিয়ে আসে এই ডাক্তারকে। তাই নীলমাধব সেন সশব্দে এসে পরিচিত ভঙ্গীতে প্রথমে দারুকেশ্বরের ঘরের ভিতরেই উঁকি মেরেছিলেন, কাজ করতে করতে অবাক হ'য়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন দারুকেশ্বর। ছোটো বৌ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো, 'ও ঘরে নয়, এ ঘরে আসুন ডাক্তারবাবু।'

'ও।' ফিরলেন ডাক্তার, স্টেথেসকোপটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'অসুখটা তা হ'লে দারুকেশ্বর-বাবুর নয়?'

'আজ্ঞে না, তাঁর ছেলের।'

'তাঁর ছেলের। কার?'

'আমার স্বামীর।'

'আপনার স্বামীর!'

এক পাড়ার লোক, বিশেষত এ পাড়ায় দারুকেশ্বর এবং তিনিই বোধহয় পুরোনোতম বাসিন্দা, সুতরাং এক পরিবারের খবর অন্য পরিবারের কানে কিছু কিছু পৌঁছয় বই কি। বিশেষ ক'রে দারুকেশ্বর মজুমদারের খবর! তাই এ বাড়ির পক্ষে এই মেয়েটিকে বুঝি বা একটু অন্যরকম লাগলো ডাক্তারের। হয়তো সেই জন্যই ভালো ক'রে তাকালেন তিনি। সদর দরজা

দিয়ে ঢুকে একফালি করিডোর পেরিয়ে তবে ছোট বৌর ঘর। গলিতে কম পাওয়ারের আলো ছিলো একটি, কিন্তু জরুরী প্রয়োজন না হ'লে কারো জ্বালাবার হুকুম ছিলো না। কেউ জ্বালতোও না। ভুলেই থাকতো আলোটার কথা। ডাক্তারকে পথ দেখাতে, আজ জ্বাললো ছোটো বৌ, আর জ্বাললো বলেই চকিত হ'য়ে বড়ো বৌ, মেজ বৌ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ বড়ো করলো, 'কে রে?'

'কে!'

'ওমা, এ দেখছি ডাক্তার!'

'ডাক্তার!'

'সেই নীলমাধব ডাক্তার। সে বার বুড়োর অসুখের সময় এসেছিলো—'

'নীলমাধব ডাক্তার! কেন রে?' বড়ো বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়ানো ফেলে এগিয়ে এলো মেজ বৌয়ের কাছে, মেজ বৌ এলো ছোট বৌয়ের ঘরের দিকে। বুড়ো আংগুলের নখে ভর দিয়ে শরীরটা দূরে রেখে গলা বাড়িয়ে পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে ফিস ফিস ক'রে বললো, 'দাঁড়াও দেখি আগে কার অসুখ।'

'ওমা, অসুখ আবার কার?' মুখ বাঁকালো বড়ো বৌ। 'সবাই-ই তো দেখি দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। বাপ তাড়িয়েছে ব'লে কারো তো একটু ইয়েও দেখি না।'

'আর ভিজিটটাই বা কে দিলো বলো দেখি। তলায় তলায় ভাব ক'রে নেয়নি তো বুড়োর সঙ্গে?'

'হ'তে পারে। তুক ক'রে তো স্বামীকে ভেড়া বানিয়েছে, আবার শ্বশুরকে এসে কী ফুস মন্তর দিয়েছে কে জানে।'

'অদ্ভুত মেয়ে বাবা। ঐটুকু তো বয়েস—'

হঠাৎ পর্দা ঠেলে ছোটো বৌকে বেরিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল। কৌতূহল নিবৃত্তি করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর জন্য বুঝি ডাক্তার এনেছিলো ছোট ঠাকুরপো ?'

'না।'

'তবে

'আমিই এনেছিলাম ওঁর জন্য।'

'কেন ওর আবার কী হ'লো ?

'পেটে ব্যথা হয়েছিলো।'

'ও বাবা, পেটের ব্যথাতেই এতোবড়ো ডাক্তার ? ভিজিট দিলে কে ?'

'আমি।'

'তুই ! কেন, বুড়ো দিলো না ?'

'উনি কেন দেবেন ?'

'আহা, ওরই তো ছেলে।'

'ছেলের সঙ্গে ওঁর কিসের সম্পর্ক।'

'যা বলেছিস। বুড়োর আবার ছেলে আর মেয়ে। সাক্ষাৎ পিশাচ। ম'রে শেষে যখ দেবে দেখিস।'

ঘর থেকে দারুকেশ্বরের গলা খাঁকারি শোনা গেল, ছিটকে দুই বৌ দুই দরজা দিয়ে যার যার ঘরে ঢুকে গেল। ছোট বৌ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তারপর ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে কাজ সেরে ঘরে এসে ভাবতে বসলো সমস্ত বাড়ির ভাড়া যদি চল্লিশ টাকা হয়, তা হলে এই একখানা ঘরের ন্যায্য ভাড়া কতো হওয়া উচিত। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে পুরো চল্লিশ টাকা ভাড়াই শ্বশুরকে পাঠিয়ে দিল।

সর্বেশ্বর এ নিয়ে তর্ক তুলেছিলো, বাবার সঙ্গে একটা কড়া রকমের বোঝাপড়া করতে যেতে চেয়েছিলো, ছোটো বৌ ধ'রে রাখলো শক্ত ক'রে, বললো, 'এ সব ব্যাপার নিয়ে আর নোংরামি নয়। যতোদিন আর একটা ঘর খুঁজে না পাই এ ভাবেই চলুক।'

'না তা হয় না।' ঘরময় অস্থির পায়ে হেঁটে বেড়ালো সর্বেশ্বর, 'অন্যায়। ভীষণ অন্যায়। এই কষ্ট ক'রে একটা বারান্দায় পড়ে থাকার জন্য এতো মূল্য দিতে হবে?'

'উপায় কী?'

'উপায় আছে। প্রতিবাদ করতে হবে, অন্যায়কে অন্যায় বলতে হবে, সে অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।'

'তুমি শান্ত হও।' স্বামীর বুকের উপর নিজের কোমল হাত বুলিয়ে দিল ছোটো বৌ, 'তুমি ভালো থাকো তা হ'লে আর আমি কিছু চাই না।' জোর ক'রে বিছানায় বসিয়ে অসময়ে এক কাপ চা ক'রে দিয়ে খুশি করলো, চা খেতে খেতে গল্প করলো, হাসলো, স্বামীর সকল ভাবনা, সকল দুঃখ ভাসিয়ে দিল ভালোবাসার স্রোতে।

'কিন্তু তোমার হাতের চুড়িগুলো', এ কথাটা আর ভুলতে পারছে না সর্বেশ্বর, বড়ো লেগেছে তার। ছোটো বৌ তৎক্ষণাৎ একগাল হেসে বললো, 'আরো যা আছে সব বিক্রী করবো। এতোদিন যে এ বুদ্ধিটা কেন মাথায় আসেনি—'

'না, না—'

'এখন মনে হচ্ছে, নগদ অতগুলো টাকা না দিয়ে বৌদির কথামতো দাদা যদি আমাকে অন্তত আদ্ধেকটাও সোনা ক'রে দিতেন—'

'বাবার কাছ থেকে আমি তোমার দাদার সব টাকা চেয়ে নেব।'

'বাবার সঙ্গে আর একটিও কথা নয়।'

'উনি ওঁর ইচ্ছে মতোই সব করবেন?'

'এতোদিনের অভ্যেস কি এতো সহজে যায়?'

'মরলেও যাবে না।'

'সুতরাং চেষ্টা কোরো না। সেই চেষ্টা বরং অন্য কোন কাজে লাগলে হাতে হাতে ফল পেতে পারবো। কিন্তু ঐ চেষ্টা নিষ্ফল।'

হয়তো তাই চুপ ক'রে গেল সর্বেশ্বর।

ধার দেনা শোধ ক'রে, বাড়ি ভাড়া দিয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে, পাঁচশো টাকা ফুরোতে খুব বেশী সময় লাগলো না। তার উপরে মাস তিনেক পরে আর একটি সন্তান হ'লো ছোটো বৌর। এটি মেয়ে। ব্যথা উঠেছিলো সকাল থেকেই, কী এক কাজের খোঁজ পেয়ে চা খেয়েই সর্বেশ্বর বেরিয়ে গিয়েছিলো, ছোটো বৌ একলা ঘরে শুয়ে সারাদিন অসহ্য ব্যথায় গুমরোলো, সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে তবে সর্বেশ্বর নিয়ে গেল হাসপাতালে। শরীরে রক্ত ছিলো না, রক্ত কিনে দিতে হলো, যমে মানুষে টানাটানি চললো দিনকয়েক, সর্বেশ্বর উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিন রাত পড়ে রইলো হাসপাতালের দরজায়।

হাসপাতালে দেখা করার নির্দিষ্ট সময় আছে, সে সময় পেরিয়ে গেলে সে দাঁড়িয়ে থাকতো ফুটপাতে। পা ধ'রে গেলে সেখানেই বসে পড়তো সে। কাছেই একটা চায়ের দোকান ছিলো, অসহ্য ক্ষিদে পেলে সেখানে গিয়ে খেয়ে নিতো কিছু।

প্রায় পনেরো দিন এই ভাবে কাটিয়ে স্ত্রীকে ভালো ক'রে মেয়ে সুদ্ধু বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলো। এ ক'দিন খোকা তার জ্যাঠাইমাদের সঙ্গেই থেকেছে। অবিশ্যি বাবা তাকে রোজই একবার ক'রে নিয়ে গেছেন মায়ের কাছে, এবার মাকে বাড়িতে আসতে দেখে খুশি হ'লো খুব। ঘুমিয়ে থাকা বোনকে আদর করলো।

বাড়ি এসেও শরীর সারতে ছোটো বৌর অনেক সময় লাগলো। অনেক টনিক খেতে হ'লো, দুধ খেতে হ'লো, ফল খেতে হ'লো। সব জোগালো সর্বেশ্বর। স্ত্রীর প্রাণ তার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেবার যে কী সুখ তা যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অনুভব করলো। ক্লান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে ছোটো বৌ যখন তাকে কাছে ডাকে, বিশ্বসংসার ভুলে যায়, ছোটো বৌ যখন নাওয়া খাওয়ার অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সব শ্রান্তি দূর হ'য়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যও ছোটো বৌ'র কাছ থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে করে না তার।

নিজের ঘরে ব'সে শুয়ে সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করেন দারুকেশ্বর। যা করেন না বা করতে পারেন না, সে খবর নিবারণ যোগায়! বৌটা যে মরতে বসেছিলো হাসপাতালে, এ খবরও যেমন তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিলো, তাঁর অমানুষ অপদার্থ ছেলেটা যে নাওয়া খাওয়া ভুলে দিবারাত্রি সেবা করে, বড়ো বড়ো ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে যমের ঘর থেকে সেটাকে ফিরিয়ে এনেছে তা-ও তেমনি জানতে পারলেন। জানতে তিনি অনেক কিছুই পারলেন, দরজার পাশে কাবুলিওয়ালা যে লাঠি

হাতে দাঁড়িয়ে থাকে সর্বেশ্বরের জন্য, তা জানতেও তাঁর দেরি হলো না। ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত একটা আনন্দের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বৌটার নষ্টামিতে সবচেয়ে ভালো ছেলেটা ফস্কে গেছে তাঁর হাত থেকে এর সাজা কি এতই সহজ? 'তুই মরবি, পচবি, গলবি', দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলতে থাকেন তিনি, 'অভাবে, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, রোগে ভুগে ভুগে ধুঁকে ধুঁকে সারা হবি। তবু আমি তাকাবো না তোর দিকে, বাপকে অমান্য ক'রে বৌয়ের পা চাটবার এই শাস্তি হবে তোর। তবে তো তুই সেই পিশাচিনীকে ছেড়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসবি। ক্ষমা চাইবি। পায়ে পড়বি। বলবি, বাঁচাও, বাঁচাও।'

৪

কিন্তু সেদিন আর আসে না। সে ইচ্ছে তাঁর কিছুতেই পূরণ হয় না। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত আসে, ওরা দিব্যি হেসে খেলে সংসার করে। এই শোনেন অসুখ করেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখেন স্যুট বুট চাপিয়ে মশ্ মশ্ ক'রে কোথায় যাচ্ছে সর্বেশ্বর। ছেলের বৌকেও দেখেন বই কি। দিব্যি হাট করছে, বাজার করছে, হাতে ধরে ইস্কুলে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে, নিয়ে আসছে চারটা বাজতে না বাজতে। বুকটা দমে যায় তাঁর, রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে আর ঘুম আসতে চায় না। বহুকাল পরে হঠাৎ স্ত্রীকে মনে পড়ে যায়, মাকে মনে পড়ে যায়, এমন কি বাবার কথাও কখন যেন ভাবতে থাকেন অন্যমনস্ক ভাবে। তারপর সব ছাপিয়ে বালক সর্বেশ্বর চুপটি ক'রে কখন

এসে বুকের তলায় ঘুমোয়, দারুকেশ্বর শূন্য বিছানায় হাত বুলোন। এক সময় উঠে বসেন তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি নিবারণকে ডেকে তোলেন, অকারণে ধমকে দেন খুব। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিবারণ অকারণে এদিকে যায় ওদিকে যায়, পাতা বিছানা আবার ঠিক করে, গোঁজা মশারি আবার গোঁজে, জল এগিয়ে দেয় দারুকেশ্বরের হাতের কাছে। যেমন হঠাৎ উঠেছিলেন, তেমনি হঠাৎই আবার শুয়ে পড়েন দারুকেশ্বর, নিবারণও নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোয়, আর শুয়েই ঘুম। দারুকেশ্বর তাকিয়ে থাকেন মশারির চালের দিকে। মনে হয় বিছানাটা বড়ো নোংরা, বড়ো শক্ত।

কিন্তু পিতার মতো গুরু আর কে আছে সংসারে? গুরুর গুরু মহাগুরু তিনি। তাঁর অভিসম্পাত কি একেবারে বৃথা যেতে পারে? ঘুরলে ফিরলে কী হবে, শরীরটা সর্বেশ্বরের সত্যি ভালো থাকলো না। শরীরের অপরাধও নেই কিছু, ঝড়ঝাপ্‌টা তো কম যায় নি। অভাব অভিযোগ অশান্তি সে তো নিত্য সহচর, তার উপরে স্ত্রীর অসুখের সময় যা অনিয়ম গেছে তার তুলনা নেই। রোদ বৃষ্টি, ঠাণ্ডা গরম, চিন্তা ভাবনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কী না! সেই থেকেই আজ একটু সর্দি, কাল একটু মাথা ধরা পরশু হজম না হওয়া এই ক'রে ক'রে জ্বর হ'য়ে পড়ে থাকলো কদিন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছোটো বৌর আহার নিদ্রা চুকে গেল। দশগাছা চুড়ির অবশিষ্ট চারগাছা রুমালে বেঁধে, আবার বেরুলো সে। বিক্রী ক'রে আবার ডাক্তার ডাকলো, ওষুধ আনলো, পথ্য কিনলো। একমাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে রেখে আপ্রাণ সেবা ক'রে ভালো ক'রে তুললো। আর ভালো হবার সঙ্গে

সঙ্গেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে খুব ভাল একটা চাকরীর খবর এসে গেল। আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলো অনেক আগে, প্রায় ভুলেও গিয়েছিলো কথাটা। ট্রাম কোম্পানীতে লীগাল এ্যাড্‌ভাইসারের চাকরী, মাইনে বেশী। অথচ কাজও খুব পরিশ্রম সাপেক্ষ নয়। এমন একটা চাকরী যে এমন অনায়াসে হ'য়ে যাবে, স্বামী স্ত্রী কেউ কল্পনা করেনি। দু'জনেই অভিভূত হ'লো, কৃতজ্ঞ হ'লো।

নিবারণ ছুটে গিয়ে দারুকেশ্বরের কাছে পেশ করলো সুখবরটা, দারুকেশ্বর তাকিয়ে রইলেন কতোক্ষণ, তারপর ধমক দিলেন, তারপর হিসাবের খাতা দেখতে দেখতে উপর দিকে চোখ তুলে দাঁত ঘষে ঈশ্বরকে শালা বললেন।

এবার বাড়ি বদলের পালা। সর্বেশ্বর বললো, 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না এখানে।'

ছোটো বৌ বললো, 'ধারগুলো শোধ করে নিলে হয় না?'

'যেখানে যাবো সেখানে বসেই ধার শোধ করা যাবে।'

'কিন্তু এখানকার ধার?'

'এখানে আবার কী ধার?'

'তোমার বাবার বাড়ি ভাড়া? চার মাস বাকি পড়েছে যে। রোজ তাগাদা দেন।'

'ও।'

'অন্য বাড়িতে যাবার আগে এটা দিয়ে যেতে হবে, নইলে দু'টো বাড়ির ভাড়া কেমন করে দেবে।'

সেটা ঠিক। বিমর্ষ মুখে চুপ করলো সর্বেশ্বর।

যখন সর্বেশ্বরের অসুখ চলছিলো, এই বাড়ি ভাড়া সেই সময়কার বাকি। ছেলেকে সুস্থ শরীরে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে, খেয়েদেয়ে সাজপোষাক ক'রে চাকরিতে যেতে দেখে সারা শরীর জ্বলে গেল দারুকেশ্বরের। আর এক মুহূর্ত তিনি তাগাদা দিতে দেরি করলেন না বাড়িভাড়ার জন্য। কতো ভেবেছিলেন, এবার বুঝি কঠিন হাতে পড়বে। উপায়হীন হয়ে ঠিক এসে ধন্না দেবে তাঁর দরজায়। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন বৌটাকে। কিছুই হ'লো না। ছেলেকে আলাদা করে দিয়েছেন, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন, তবু যেন যথেষ্ট শাস্তি পাচ্ছে না ওরা। রোগে ভুগছে, দেনায় তল হয়েছে তবু ভেঙে পড়ছে না। একটা সুখের আভাসে, শান্তির আশ্বাসে ওরা যেন সর্বদাই তৃপ্ত, ধৈর্যশীল। হেরে যাচ্ছেন দারুকেশ্বর, যতো হারছেন ততো জেদ বাড়ছে তাঁর, ততো রাগ বাড়ছে।

হয়তো এই রাগের ফলেই আবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে হুলুস্থুল হ'লো বাড়িতে। বড়ো বৌ মেজো বৌ আশান্বিত হৃদয়ে ভাবতে লাগলো, বুড়োকে কোন্ খাটটায় চড়িয়ে শ্মশানে পাঠাবে, বড়ো ছেলে, মেজো ছেলে বাবা ব'লে হুমড়ি খেয়ে শিয়রে ব'সে শোকের প্রতিযোগিতায় এ ওকে হার মানাতে চেষ্টা করলো, ছোটো ছেলে গুম হয়ে বসে রইলো নিজের ঘরের মধ্যে, ছোটো বৌ রাগ অভিমান ভুলে কাছে এসে দাঁড়ালো। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বুড়ো দারুকেশ্বর কিন্তু আবার ফিরে এলো মরার ঘর থেকে।

ভালো হয়ে নিভৃতে খোদ চাকর নিবারণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অসুখের সময় কে কে আমাকে দেখতে এসেছিলো রে?'

নিবারণ বললো, 'আজ্ঞে কর্তা, পিত্তিবিশিয়া সব্বোদাই খোঁজখবর নিতো।'

দারুকেশ্বর খিঁচিয়ে উঠলেন, 'গর্দভ কোথাকার। প্রতিবেশীর কথা কে জিজ্ঞেস করেছে তোকে?'

'তবে কর্তা কার কথা বলবো।'

'কার কথা আবার, বাড়ির লোকের কথা বলবি। দাদাবাবুদের কথা বলবি।'

'ও।' হদিস পেয়ে একগাল হাসলো নিবারণ। 'তা দাদাবাবুরা খুব করেছে বটে। সারাদিন দেঁড়িয়ে থেকেছে, ডাক্তার ডেকেছে—'

'কোন্ দাদাবাবু বেশী করেছে?'

চিন্তা করলো নিবারণ, চোখ কুঁচকে বললো, 'তা দুই দাদাবাবুই বোধহয় সমান—'

'দুই দাদাবাবু! আর কেউ না?'

'বৌদিরাও আছেন।'

'রেখে দে বৌদিদের কথা—আগে দাদাবাবুদের কথা বল।'

'আজ্ঞে ঐ বললাম তো বড়োদাদাবাবু ডাক্তার ডেকেছেন, সেজদাদাবাবু শিয়রে থেকেছেন—'

'আর?'

'আর! ও।'

কর্তার আসল প্রশ্নটা এতক্ষণে বুঝলো নিবারণ। হাত উল্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'না, ছোটোদাদাবাবু ঘরে আসেন নি। তবে ছোটো বৌদি যা সেবা করেছেন না দেখলে—'

'ঘরে আসেনি?'

'আজ্ঞে কর্তা না।'

'ছোটো বৌকে ঢুকতে দিয়েছিলি কেন?'

'তিনি তো নিজেই এসেছেন, কেউ তো ডাকেনি তাকে। তবে একথা আমি বলবোই কর্তাবাবু, ছোটো বৌমা না এলে আপনাকে বাঁচানো কঠিন হ'তো। দু'হাতে কে অমন ময়লা ঘাঁটতো? বিছানাপাটি দেখেন তো—'

'যা যা, বেশী বকতে হবে না তোকে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা, কেবল বাজে কথা। শোন্, লোকটার তো শুনেছি অসুখ করেছে, খেতে পায় না, তবে এতো তেজ কিসের? শুনে রাখ এর ফল একদিন সে পাবেই, পাবেই, পাবেই।' কাজের দপ্তর খুলে বসলেন দারুকেশ্বর, তাঁর ক্রুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারে অধীনস্থরা তটস্থ হ'য়ে উঠলো।

এর পরে ঈশ্বর দারুকেশ্বরকে সত্যি দয়া করলেন, তাঁর অনমনীয় অহংকার, রাগ, ব্যর্থতা এবং প্রতিশোধ স্পৃহাকে সার্থক ক'রে আবার সর্বেশ্বর বিছানা নিল। এবার সত্যি শক্ত হাতেই পড়লো। ডাক্তার বললেন, 'বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে।' সর্বেশ্বর বললো, 'নতুন চাকরী, এতো ছুটি পাব কেমন ক'রে।'

ডাক্তার বললেন, 'তা বললে চলবে না।' তার পর তিনি মস্ত এক সার্মন দিলেন। 'আপনার একমাত্র চিকিৎসাই হচ্ছে আপনার বিশ্রাম। অন্তত একটা বছর। আপনি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্লান্ত, আপনার রক্তের চাপ আপনার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত কম, হৃদ্‌যন্ত্র ভালো না, তার উপরে অজীর্ণ রোগে ধরেছে। আপনার এখন প্রধান কর্তব্য হচ্ছে চেঞ্জে যাওয়া, সারাদিন খোলা আকাশের তলায় একখানা ডেক চেয়ারে বসে সামান্য গল্প গুজব করা বা হাল্কা কোনো বই পড়া আর খুব

ভালো ক'রে খাওয়া। প্রোটিন ফুড খেতে হবে। ঐ বাঙালীর চিরাচরিত শাক ভাত খাওয়া নয়, জাঁদরেল ইয়োরোপীয়ানদের মতো ভেড়া খাসি গরু ইত্যাদির হাড় মাস চিবোনো। ডিম খাবেন, সঙ্গে ব্যালেন্স রেখে ফল খাবেন—'

মাথা নিচু ক'রে সব শুনলো সর্বেশ্বর, তার পর ভিজিট দিয়ে বিদায় দিল ডাক্তারকে। আর তার পরে জামা জুতো পরে বেরুবার উদ্যোগ করলো। ছোটো বৌ বললো, 'এ কি! কোথায় যাচ্ছো?'

'কাজে। ডাক্তারের কথা শুনতে গেলে আমার চলবে না। এই ক'দিনের বিশ্রামেই আমি বেশ ভালো বোধ করছি।' ছোটো বৌ চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো একটু, তারপর কাছে এসে বোতাম খুলে জামাটা ছাড়িয়ে নিল, নিচু হ'য়ে জুতোর ফিতে খুলে দিল, হাত ধ'রে বসিয়ে দিল খাটে।

দশগাছা চুড়িই না হয় গেছে, আরো তো আছে। সর্বদা পরবার সরু হার আছে, মায়ের গলার স্মৃতিচিহ্ন মস্ত মফচেনটা আছে, কানের ফুল আছে দু' জোড়া, উপহারের আংটি আছে তিনটে, রূপোর সিঁদুরের কৌটো আছে কতকগুলো—তার বিনিময়েও কি ডাক্তারের নির্দেশ মানার মতো অর্থ আসবে না হাতে? সুতরাং ছোটো বৌ আবার বেরুলো। কেবল মায়ের গলার হারটা বিক্রী করবার সময়ে একটু কামড় পড়লো বুকের মধ্যে। এই হারটা যে মাকে ছেলেবেলায় পরতে দেখেছে। এই হারটার মধ্যে মায়ের ছোঁয়া লেগে আছে। তা হোক, বরং এই হারটার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে সেটাই সর্বেশ্বরের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ হবে।

বহুদিন পরে দাদাকে চিঠি লিখতে বসলো একটা।

'দাদা, অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নি, আশা করি, টুলু, বিলু, ছোটুকে নিয়ে তুমি আর বৌদি ভালো আছো। সেই যে শীতকালে একবার এসে দেখে গেলে আর তোমার দেখা নেই। আমার পাঁচ বছর যাবত বিয়ে হ'য়েছে, মাত্র একবার তোমাদের দেখেছি। মেয়েদের বিবাহ যে পিত্রালয়ের সঙ্গে কী ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ তা খুব ভালো ক'রেই অনুভব করতে পারছি। অবিশ্যি নিজেদের দেশ এখন আমাদের বিদেশ হ'য়েছে ব'লেই হয়তো এই দশা হয়েছে। যাই হোক এবার আমি মাস কয়েকের জন্য যাবোই স্থির করেছি। তার জন্য ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি যা যা করণীয় ক'রে নেবো। তোমার ভগ্নিপতির শরীরটা কিছুকাল যাবৎ ভালো যাচ্ছে না। ওখানে, আমাদের ঢাকার খোলা মেলা বড়ো বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকলে হয়তো ওঁর একটা পরিবর্তন হবে। তুমি চিঠি লিখলেই আমি যাবার আয়োজন করবো।'

চিঠি পেয়েই দাদা জবাব দিলেন, 'কবে আসবি জানা। আমি তোদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা করে থাকবো।' তারপর লিখলেন, 'তোকে কয়েকটা কথা জানানো দরকার। দেনার দায়ে আমাদের ঢাকার বাড়িটা নীলেম হয়ে গেছে। সেই জন্যই সব নিয়ে এখন আমরা দেশের বাড়িতে আছি, এখানে এসেই তোর বৌদি হঠাৎ পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে শয্যাশায়ী হয়েছেন। ছ'মাস হ'য়ে গেল, এখনো তিনি সেরে উঠলেন না। ছেলেদের নিয়ে সংসার আমার নরক হ'য়ে উঠেছে। তলায় তলায় অনেক দিন আগেই ক্ষয়ে গিয়েছিলাম, এখন নৌকোয় স্রোতের মতো জল ঢুকছে, অর্থাৎ ডুবতে আর

দেরি নেই। তবু তার মধ্যে এইটুকুই সান্ত্বনা তুই এই অভাবের মধ্যে নেই, যে ভাবে হোক তোকে আমি দারিদ্র্যের এই অন্ধকার থেকে আলোর দরজায় পৌঁছে দিতে পেরেছি।

এ সব কথা এতোদিন জানাইনি ব'লে রাগ করিস না। দুঃখ পাবি ব'লেই লিখিনি। কিন্তু এখন যদি আসিস, তা হ'লে নিজের চোখেই দেখবি সব, হঠাৎ ধাক্কা লাগবে। অসুস্থ স্বামী নিয়ে এসে সেই মনখারাপের মধ্যে যাতে আবার এই আঘাতটা না পাস সেজন্যে আগেই সব জানালাম।

বাড়িটা গিয়েই যে আমি সম্পূর্ণ ধারমুক্ত হ'তে পেরেছি তা নয়। তোর বিয়ের সময়কার আরো কিছু দেনা এখনো আমি শোধ ক'রে উঠতে পারিনি। এই চৈত্রে একটা কিস্তি যেমন ক'রে হোক দিতেই হবে আমাকে। সর্বেশ্বর যদি এই দুঃসময়ে আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারে বড়ো উপকার হয়। আমার অবস্থা নিশ্চয়ই তুই বুঝতে পারবি।

আবার লিখি, তোর জন্য, তোর ছেলেমেয়েদের জন্য, আমি আশাপথ চেয়ে ব'সে রইলাম। আসিস। তোর বৌদিও তাই লিখতে বললেন। ইতি—

তোর হতভাগ্য দাদা লোকনাথ মিত্র।'

চিঠি পেয়ে এবং প'ড়ে স্তব্ধ হলো ছোটো বৌ। তার চিরাচরিত অভ্যাস মতো জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। সেদিন তার খাওয়া হ'লো না, নাওয়া হ'লো না, বুকের ভিতরটা ফাঁকা মনে হ'লো।

সর্বেশ্বর বললো, 'কার চিঠি?'

ছোটো বৌ বললো, 'দাদার।'

'কী লিখেছেন ?'

'এই সব সংসারের খুঁটিনাটি আর কি।'

'ভালো আছেন সব ?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন আসেন নি, আসতে লেখো না একবার।'

ঘুমন্ত মেয়েকে অনর্থক কাঁদিয়ে কোলে নিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে মুখ ফিরিয়ে ছোটো বৌ অস্ফুটে বললো 'লিখবো।'

সমস্ত গহনা বিক্রীর পুরো আটশো টাকা থেকে চারশো টাকা সেদিনের ডাকেই দাদাকে মণিঅর্ডার করে দিল ছোটো বৌ, তারপর রাত্রে বসে আবার চিঠি লিখলো, 'দাদা, সমস্ত খবর শুনে বড়ো কাঁদতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু চোখে জল এলো না। এ বিষয়ে আমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপণতা অসীম।

তোমার এই দুঃসময়ে মাত্র এই সামান্য টাকা ক'টা পাঠাতে আমার খুব লজ্জাও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। তোমার ভগ্নিপতির পিতা ধনীব্যক্তি হ'তে পারেন কিন্তু ভগ্নিপতি তা নয়। তাঁর হাতে এই সময়ে এর চেয়ে বেশী ছিলো না। যদি তোমার তিলতম কাজেও এই ক'টা টাকা ব্যয় হয় আমি ধন্য হবো, সার্থক হবো।

ডাক্তার বলছেন, তোমার ভগ্নিপতির এখন কলকাতায় থেকে চিকিৎসা করানোই ভালো, তাই তোমাদের কাছে যাওয়াটা আপাতত পিছিয়ে দিতে হ'লো। সে জন্য দুঃখ কোরো না। সংসারটা বড়ো গোলমেলে জায়গা, সেখানে ইচ্ছার কোনো দাম নেই। সর্বদা তোমাদের খবর আমাকে জানিয়ো, আমি যে কতো অস্থির থাকবো, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। ইতি—

তোমাদের মাধবী'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

সর্বেশ্বরের অসুখের চেহারাটা কিন্তু তেমন ভয়াবহ নয়। ওঠে, বসে, খায় দায়, মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে গিয়েও দাঁড়াও। ডাক্তারের সমস্ত আদেশ নির্দেশই সর্বতোভাবে পালন করছে ছোট বৌ। খাওয়া দাওয়ার এতোটুকু ত্রুটি হ'তে দিচ্ছে না, ছুটে ছুটে নিজেই বাজারে যাচ্ছে, মুরগী আনছে স্যুপ বানাচ্ছে, ফল মিষ্টি দুধ—শুধু চেঞ্জেই নিয়ে যেতে পারলো না, আর বাড়িটা বদলানোও সম্ভব হ'লো না।

দেখতে দেখতে দু'টো মাস কেটে গেল। আপিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু সর্বেশ্বরের শরীরে এক ফোঁটা বেশী বল সঞ্চয় হ'লো না, রক্তের নিচু চাপ এক সংখ্যা উঁচুতে উঠলো না। বরং দিন দিন তার খাওয়ার ইচ্ছে কমে যেতে লাগলো, হজমের গোলমাল দ্বিগুণিত হ'লো, আর ছোট বৌর হাতের পুঁজি শূন্যে এসে ঠেকলো। সর্বেশ্বর বললো, 'আমাকে এবার কাজে যাবার অনুমতি দাও তুমি, ব'সে ব'সেই আমার শরীর বেশী খারাপ হচ্ছে।'

ছোটো বৌ চোখ নিচু ক'রে কাছে এসে দাঁড়ালো, বুকের আঁচলটা ভিজে গেল তার। সর্বেশ্বর ঐ শরীর নিয়েই আপিসে গেল ট্যাক্সি ক'রে, কাজে জয়েন না করলে চাকরী যাবে, খাবে কী? শরীরটাকে টেনে টেনে মাস দুই নিয়ে যেতে পারলো বটে, কিন্তু তৃতীয় মাসেই আবার বিছানা নিতে হ'লো। আবার

ডাক্তার এলেন, আবার আদেশ নির্দেশের শিলাবৃষ্টি। ছোটো বৌ এবার অন্ধকার দেখলো চার দিক।

ঠিক এই রকমটাই চেয়েছিলেন দারুকেশ্বর, এই রকমই একটা নিরুপায় অবস্থা। নিবারণের কাছে সব শুনে ভিতরে ভিতরে তিনি উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। প্রত্যেক মুহূর্তে আশা করতে লাগলেন, তাঁর দয়ার ভিখিরী হ'য়ে অপদার্থ টা ছেলেপুলে নিয়ে এলো বলে দরজায়, হাত পাতলো বলে। মনে মনে তিনি দৃশ্যটাকে সাজান আর ভাঙেন, নরম হন আর গরম হন। আর উপভোগ করেন।

এই রকম ক'রে ক'রেই কেটে যেতে লাগলো দিন। কিন্তু দারুকেশ্বরের স্বপ্নকে সার্থক ক'রে না ছেলে না বউ—কেউ এসে দাঁড়ালো না কাছে ; দোষ করেছি, অন্যায় করেছি ব'লে কেউ ক্ষমা চাইলো না, সাহায্য চাইলো না। কেবল বাড়িভাড়াটা আবার বাকী পড়লো দু'মাসের। তখন তিনি সেই ছিদ্রটুকু অবলম্বন ক'রেই মরিয়া হ'য়ে উঠলেন। বাড়িভাড়ার তাগাদায় জর্জরিত ক'রে তুললেন ছেলে-বৌকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গালাগালি দিলেন, সাতদিনের মধ্যে ভাড়া না পেলে বার ক'রে দেবেন ব'লে শাসালেন। সাত দিন সময় যখন দিয়েছেন, অপেক্ষা করতেই হলো। আট দিনের দিন সকাল বেলা এক টুকরো কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো নিবারণ। সর্বেশ্বর লিখেছে, 'মৃত্যুর আগে অবশ্যই আপনার বাড়িভাড়া আমি পরিশোধ ক'রে দেবো।' উপরে কোনো সম্বোধন নেই। তলায় নাম স্বাক্ষর করা আছে।

চিঠিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দারুকেশ্বর,

অনেকক্ষণ ধ'রে পড়লেন। তারপর যেন চটকা ভেঙে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, 'মহেশ।'

'আজ্ঞে।' স্নানের ঘর থেকে গামছা পরিহিত প্রায় অর্ধউলঙ্গ মহেশ্বর ছুটে এলো এ ঘরে।

দারুকেশ্বর গর্জন করলেন, 'কী করছিলি তুই? রোহিত কোথায়?'

'আজ্ঞে তিনি তো বৌদিকে বালেশ্বরে পৌঁছে দিতে গেছেন। তারপর সেখান থেকে উড়িষ্যায় যাবেন সেই বড়ো অর্ডারটা—'

'জানি, আর বলতে হবে না। চাকরটা কোথায়?'

'ডেকে দেবো?'

'না। তুমি শোনো—' তুই থেকে তুমি সম্বোধনেই বোঝা গেল খুব জরুরী কথা আছে এর পরে, 'আমাদের পূবের ঘরে যে ভাড়াটেরা থাকে, ছ' মাস তারা বাড়িভাড়া দেয়নি।'

অবাক হ'য়ে রোহিতেশ্বর বললো, 'ভাড়াটে বলছেন কাকে?'

'কাকে আবার, জানো না। এই ছাখো'—সর্বেশ্বরের চিঠিটা মেলে ধরলেন তিনি, 'তোমার উপর এই ভাড়া আদায়ের ভার দিলাম। তিন দিন তিন রাত্রির মধ্যে আমার ভাড়া চাই।'

'আজ্ঞে শুনছি, ওর বড়ো অসুখ, ছোটো বৌমা সারাদিন—'

'চুপ করো। কার অসুখ আর কে সারাদিন কী করছে, তা আমি শুনতে চাই না। চাই আমার ভাড়া। ব্যস।'

'আমি এখুনি স্নান ক'রে খেয়ে হাওড়া যাবো, আমার ট্রেন—'

'ট্রেন! তুমি আবার যাচ্ছো কোথায়?'

'আপনি আজকাল সব ভুলে যান। কাল রাত্রে আপনি তো রাঁচি যাবার কথা বলেছেন।'

'ও।'

'তাই বলছিলাম, ভাড়া আদায়ের জন্য'—

'চুপ করো।' দারুকেশ্বর গর্জে উঠলেন, 'সব তোমরা এক ঝোপেব বাঁশ। ঐ লোকটা ভাড়া দিক আসলে সেটাই তোমার ইচ্ছে নয়। তলায় তলায় নিশ্চয় সাহায্য করো।'

'না।'

'নিশ্চয় করো।'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক বলছো?'

'ঠিক বলছি।'

'না করলে ওদের চলে কী করে?'

'জানি না।'

'তোমার কাছে চায় না?'

'না। সর্বা নাকি বলেছে আপনাব এক পযসাও সে আর ছোঁবে না।'

'কী।'

'বলেছে, যেহেতু আমি আর দাদা আপনার অধীন, এখনো আপনাবটাই খাই পবি তাই আমাদের সাহায্যও সে নেবে না কোনোদিন।'

'এতো। এতো তেজ! বেশ। দেখা যাক কদ্দিন চলে। বুকে হাঁটতে হাঁটতে আসে কিনা আমাব দরজায।'

'বৌমা বোধহয তাঁর গযনা বেচে চালাচ্ছেন, তবে শুনছি এখন আর—'

'চলছে না। অর্থাৎ কিছু টাকা দাও, এই তো? ব'লে দিও আমার দ্বারা ওসব হবে না। তবে হ্যাঁ, বাড়ির উপর যখন

রয়েছে, আর এটা যখন একটা ব্যারাম পীড়ার ব্যাপার, ডাক্তার ডাকতে হ'লে ধার দিতে পারি, ওষুধপথ্যের জন্য আরো না হয় কিছু ধ'রে দেয়া যাবে।'

'আমি ওদের জানিয়ে দেবো, সে কথা।'

'হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানিয়ে দিও, তেমন ধরাধরি করলে, ঐ অসুস্থ লোকটার জন্য, মানে, বলছিলাম যে, লোকটার অসুখই করেছে, তখন তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, না হয় বাড়িভাড়াটাও মাপ ক'রে দেওয়া যাবে।'

'তা-ও বলবো।'

'কী বলবো বলবো করছো, এখুনি বলো গিয়ে। একটা ডাক্তার ডেকে দেখাক ভালো ক'রে, কেবল লম্বা লম্বা বক্তৃতা।' গড়গড় করতে করতে ঘরে ঢুকে গেলেন দারুকেশ্বর। গামছাপরা মহেশ্বরও হাঁফ ছেড়ে বেঁচে পালালো।

২

সেই দুপুরে বাড়িটাতে হঠাৎ বড়ো নির্জন বোধ করতে লাগলেন দারুকেশ্বর। যদিও নির্জন বাড়িই তিনি পছন্দ করেন, ছেলেপুলের কান্নাকাটি বায়না আবদার এসব শুনলেই ছুটে গিয়ে তাদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আজকের এই নির্জনতা যেন তাঁকে অদ্ভুত একটা দমচাপা অন্ধকারে নিয়ে গেল। যেখানে শুধু জনপ্রাণীই নয়, গাছপালা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন। একটা অন্ধকারের মরুভূমি। হাঁক দিলেন, 'নিবারণ।' ক্লান্ত হ'য়ে নিবারণ সবে একটু গা এলিয়েছিলো দৌড়ে ছুটে এলো।

'ঘুম আর ঘুম, তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন, ঘুমোবার জন্যই রেখেছি তোমাকে, না ?'

'আজ্ঞে আমি তো ঘুমুইনি ?'

'তবে এতোক্ষণ ছিলে কোথায় ?'

'মেজোবাবুকে ঠিক ঠাক ক'রে দিলুম, তারপর গাড়ি ডেকে মাল তুলে—'

'থাক, থাক আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। পা টেপ।' নিঃশব্দে নিবারণ পা টিপতে বসলো।

একটু সময় চুপ ক'রে থাকলেন দারুকেশ্বর, বুঝি চোখে একটু তন্দ্রা লেগে এলো। তক্ষুনি জেগে উঠলেন, 'বাড়িটা আজ এতো চুপচাপ লাগছে কেন বলতে পারিস ?'

নিবারণ বললো, 'আজ্ঞে, সারা বাড়ি খাঁ খাঁ, কোনো ছেলে-পুলে নেই, দাদাবাবুরা নেই, বৌদিরা—'

'কে বললো, নেই,' দারুকেশ্বর চটে উঠলেন, 'ঐ ঘরে যে আর একটা লোক তার পরিবার নিয়ে আছে, তা বুঝি ভুলেই মেরে দিয়েছ ?'

'না কর্তা, ভুলবো কেন। তবে তেনারা আলাদা কিনা।'

'আলাদা তো কী হ'য়েছে। না হয় খায় না একসঙ্গে, কিন্তু থাকে তো।'

'এ দিকের দরজাটা সারাদিনই বন্ধ থাকে, নিতান্ত দরকার না পড়লে কেউ তো আসে না এদিকে— ঘরের মধ্যে যে কী হচ্ছে, না হচ্ছে —'

'এক বাড়িতে বাস ক'রে কিছুই জানতে পার না, না ?' সব কথাতেই রেগে আছেন দারুকেশ্বর। নিবারণ চুপ করলো।

'যা, এখন গিয়ে দেখে আয়, দরজাটা খোলা কি না।'

পা টেপা ছেড়ে দেখে এলো নিবারণ।

'কী দেখলি?'

'দরজা বন্ধ কর্তা।'

'আচ্ছা, দরজাই না হয় বন্ধ, তা বলে লোকগুলো তো মরে যায় নি, বলি, সাড়া-শব্দ পেলে কিছু?'

'আজ্ঞে কর্তা না।'

'কান থাকলে তো পাবি।'

নিবারণ আবার পা টেপায় মনোযোগ দিল। তারপর কর্তাকে খুশি করার জন্য বললে, 'দাদাবাবুর বোধহয় অসুখ বেড়েছে।'

'অসুখ! কেন? কী ক'রে জানলি?'

'আজ জানালায় দাঁড়িয়ে ছোটো বৌমা কাঁদছিলেন।'

'কাঁদছিলেন। তা কাঁদুক। যেমন কর্ম, তেমন তো ফল হবে।'

'তা তো ঠিকই।'

'কী ঠিক! কী জানো তুমি?'

ঘাবড়ে গিয়ে চুপ ক'রে রইলো নিবারণ।

দারুকেশ্বর কিন্তু চুপ করলেন না, বললেন, 'তুমি বুঝি ওদের ঘরে গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন? কেন গিয়েছিলে?'

'আপনি ভাড়ার তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন।'

'ও, তাগাদা শুনেই কান্না।'

'দাদাবাবু খুব রোগা হ'য়ে গেছেন।'

'তাতো হবেই।'

'ঐ খৎখানা লিখতেও দাদাবাবুর হাত কাঁপছিলো।'

দারুকেশ্বর অন্যমনস্ক হ'লেন।

১

'আপনি রাগ করবেন ব'লেই তাগাদাটা দিলাম, নইলে মনটা আমার ছোটো দাদাবাবুর জন্য বড়ো উদাস লাগছিলো। কর্তা, এতোদিন এই বাড়িতে আছি এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি, ছোটো বৌদির মতোও কেউ না, ছোটো দাদাবাবুর মতোও কেউ নয়, কিন্তু সংসারে ভালো মানুষেরাই দুঃখ পায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর ইয়ে করতে হবে না। যাও, ঘুমুতে দাও আমাকে।' পা টেনে নিয়ে পাশ ফিরলেন দারুকেশ্বর।

এর পর কয়েকদিন হঠাৎ কাজের চাপ খুব বেড়ে গেল। সময়টা ব্যবসার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হ'য়ে উঠলো, দুই ছেলেই বাইরে বাইরে ঘুরছে বাণিজ্যের জন্য। তারা চিঠি লিখলো, যখন যেখানে যে অর্ডারের জন্য যাচ্ছে—তাই হ'যে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। তার জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছে না, মদ দিতে হচ্ছে না, খোসামোদ করতে হচ্ছে না। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটলো দারুকেশ্বরেব, মেজাজটা খোস হ'লো, খুব ভালো মনে কাটতে লাগলো দিনগুলো। পুবের ঘরের বাসিন্দাদের ভুলেই রইলেন প্রায়। বাড়ি ভাড়ার তাগাদাতেও ভাঁটা পড়লো। মাঝে কিছুদিন যাবত দারুকেশ্বরের একেবারেই ঘুম হচ্ছিলো না। যদি বা একটু ঝিমিয়েছেন, দুঃস্বপ্নের চাপে তখুনি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে সেই ঘুম। সেদিন সন্ধ্যে থেকে সমস্ত রাত চমৎকার একটি নিটোল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন। এমন ঘুম তিনি বহুকাল ঘুমোন নি। সকালে উঠে খুব ভালো লাগলো, হাল্কা লাগলো, ঝরঝরে মনে হ'লো। হাত মুখ ধুয়ে এসে খুশি মনে এক গ্লাস গরম দুধে চুমুক দিলেন! আর চুমুক দিয়েই অদ্ভুত একটা চাপা অথচ মর্মভেদী কান্নার আওয়াজে চমকে উঠে

ফিরে তাকালেন পুবের ঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুপদাপ কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন তারপরই নিবারণ দৌড়ে এসে খবর দিল, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী, কী?' দারুকেশ্বরের গলার স্বর অনর্থক কেঁপে গেল, হাত কেঁপে খানিকটা দুধ চলকে পড়লো বিছানায়, দাঁতে দাঁত আটকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'কর্তাবাবু, ছোটো দাদাবাবু আর নেই।' বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে আবার ছুটে বেরিয়ে গেল নিবারণ।

দারুকেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হ'য়ে। শরীরটা পাথরের মতো ভারি হ'য়ে উঠলো।

অথচ ভালোই ছিলো সর্বেশ্বর। এমন একটা চরম পরিণতির জন্য এতোটুকুও প্রস্তুত ছিলো না ছোটো বৌ। সর্বেশ্বরও বোধ হয় নয়। শুধু একটু জ্বর হ'য়েছিলো কাল সন্ধ্যের দিকে। ইদানীং প্রায়ই জ্বর হচ্ছিলো তার। হজমের গোলমালটা বাড়লেই তাপ উঠতো শরীরে। সেটা যে এমন কিছু মারাত্মক, কল্পনাও করতে পারেনি কেউ। শুতে এসে রাত্তিরে ছোট বৌ মাথা টিপে দিয়েছে, গায়ে হাত বুলিয়েছে, গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে শুয়ে। ঘুম ভেঙে তাকিয়েই নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এসেছে তার, ছুটে গিয়ে ধরতে ধরতেই যেন পালিয়ে গেল মানুষটা। যেন মস্ত এক রসিকতা করলো।

বোঝা গেল খাট থেকে নামতে গিয়েছিলো সর্বেশ্বর, টাল সামলাতে না পেরেই পড়ে গেছে, অথবা কোনো রকমে হোঁচট খেয়েছে। মেঝে থেকে অত বড়ো মানুষটাকে ধরে তোলা

ছোটো বৌর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ছিলো না, প্রথমটায় সে ব্যাকুল হ'য়ে কী যে করলো আর করলো না, কিছুই মনে নেই। শেষে ছুটে গেল গ্যারেজ ঘরে। টাইপিস্ট ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে এলো। এই বাড়িতে এই একটি মানুষের কাছেই কোনো কিছুর দরকার হলে (অর্থের নয়, সামর্থ্যের) সাহায্য নিত সর্বেশ্বর। অল্পবয়সী, লাজুক, নম্র এই দুঃখী ছেলেটির প্রতি কেমন একটু আলাদা মমতা ছিলো তার।

ডাক্তার এসে ঘোষণা করলেন হার্টফেল। আর পারলো না ছোটো বৌ, তার সমস্ত ধৈর্য সহ্য বুদ্ধি যুক্তি সব ভাসিয়ে দিয়ে একটা আর্তনাদ উঠে এলো ভিতর থেকে। সেই কান্নাটাই শুনতে পেয়েছিলেন দারুকেশ্বর। তারপরেই চুপ।

মৃতদেহ বার করতে দেরি হ'লো না বেশী। আর কোনো কান্নাকাটির আওয়াজও পাওয়া গেলো না। কেবল সর্বেশ্বরের চার বছরের ছেলেটা অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো মেঝের ওপর। ঘরের সামনেই ছোট্ট উঠোন, সেখানে এনেই শোওয়ানো হ'লো সর্বেশ্বরকে, প্রতিবেশী মহিলাদের মধ্যে কে যেন ধ'রে ধ'রে নিয়ে এলো ছোটো বৌকে, ছোটো বৌ পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে আবার মূর্ছা গেল।

দারুকেশ্বরের ঘরে ব'সেই জানালা দিয়ে দেখা যায় উঠোনটা। দারুকেশ্বর উঁকি মেরেই ঠাস ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন সেটা। ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি হলো, দাঁতের চাপে ঠোঁটটা কেটে কয়েক ফোঁটা টক্‌টকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে পড়তে থুতনির কাছে এসে শুকিয়ে গেল। অস্ফুট হরিধ্বনি উঠলো বাতাসে,

শুনে কানে আঙুল দিলেন। মড়া নিয়ে যেতে যেতে লোকেরা বললো, 'বুড়োটা একটা চামার।'

ঘটনাটা ঠিক প্রত্যাশিত নয়। কী একটু সামান্য অসুখ করেছে আর অমনিই যে বন্ধ দরজার ওপিঠে দৌড়ে এসে মৃত্যুর দূত ওৎ পেতেছে, এমন একটা কথা ভাবতেই পারেন নি দারুকেশ্বর। তাঁর নিজের বয়স একাত্তর, আর সর্বেশ্বরের বয়স বত্রিশ। তাঁর ঘর বাদ দিয়ে যে মৃত্যু পূবের ঘরের বাসিন্দার উপরই এমন ঝাঁপিয়ে পড়বে কী ক'রে জানবেন! এ তো সেই সর্বেশ্বর, যে সর্বেশ্বরকে এইটুকু রেখে তার মা সূতিকা রোগে চোখ বুজেছিলেন।

দারুকেশ্বর হন্ হন্ ক'রে ঘরের এমাথা ওমাথা পায়চারি করতে লাগলো। ঐটুকু তো ঘর, তার মধ্যে রাজ্যের জঞ্জাল। একদিকে মস্ত উঁচু খাট তাঁর বিয়ের। তাইতেই জুড়ে আছে সব। খাটটাতে জাজিম নেই, চাটাই পাতা। ছোটোবৌ যে তোষক বালিশ দিয়ে একদিন পরিষ্কার ক'রে বিছানা পেতে দিয়েছিলো, সে সব এই ঝগড়ার মধ্যে কোথায় টান মেরে ফেলে দিয়েছেন। শেষে কি পিশাচিনীর পাতা বিছানায় শুয়ে নরকে যাবেন? তার চেয়ে ম'রে গেলে কী হয়? এখন খাটটা একটা তীর্থক্ষেত্র হ'য়ে আছে। মাথার কাছে মস্ত কাঠের বাক্স, সেখানেই তাঁর টাকাকড়ি থাকে, পাশে দেয়াল ঘেঁসে তিনটে উঁচু ট্রাঙ্ক। কী যে অমূল্য সম্পত্তি আছে তার মধ্যে তা শুধু তিনিই জানেন। খাট ছাড়া আরও আসবাব আছে। কাঠের একটা মস্ত আলমারি, একটা কাঁঠাল কাঠের টেবিল, দু'টো হাতলভাঙা চেয়ার। (একটা আপিস তো বটে, চেয়ার টেবিল না থাকলে

চলবে কেন ?) টেবিলের ওপর কাগজপত্রের স্তূপ কলমদানিও আছে একটা। দু' পাশেই দুই দোয়াতে লাল কালি আর কালো কালি। দু'টি লম্বা হাড়ের কলম সুঁচোলো নিব নিয়ে শুয়ে আছে কলমদানির ঢালা নালায়।

ঐ স্বল্পপরিসর ঘরের মধ্যেই চক্কর খেতে খেতে ঘেমে উঠলেন তিনি। শ্রান্তিতে বৃদ্ধবুকের জীর্ণ পাঁজর ব্যথা করতে লাগলো ! একসময় থামলেন, আবার জানালাটা খুলে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন শূন্য উঠোনটার দিকে।

ঐইটুকুই শুধু, তাবপরের দিন থেকেই আর কোনো ভাবান্তব দেখা গেলো না দারুকেশ্বরের। ঠিক তেমনিই রুটিন মতো ভোর না হ'তে উঠলেন, চা খেলেন, দুধ খেলেন, টাইপিস্ট ছেলেটিকে ডেকে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে কাজ বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, 'বাঁচির বিলটা শীগগির টাইপ ক'রে ফেলো। মিস্ত্রি ডেকে প্যাকিং কেসগুলো এখুনি বানাতে দাও।' অন্য ছেলেটিকে বললেন, 'শীগগির হরেনকে একবার তাগাদায় পাঠাও। বস্তির লোকগুলো ভারি বদমাস, তাগাদা না পেলে ভাড়াই দিতে চায় না। দেবো শালাদের উঠিয়ে। আর একজন তো দিব্যি ফাঁকি দিযে পালালে। বলেছিলো না মরবার আগে শোধ দেবো, কই, কথা দিযে কথা কি সে রাখলো ?'

ছেলেটি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো 'কার কথা বলছেন ?'

হাত-পা নেড়ে দারুকেশ্বর বললেন, 'আরে, ঐ পূবের ঘরের বাসিন্দার কথা।'

দু'জনেই হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো দারুকেশ্বরের মুখের দিকে।

৩

টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এলো রোহিতেশ্বর আর মহেশ্বর। দিদিও এলেন। তিন ভাই-বোন জড়াজড়ি ক'রে খুব খানিকটা কাঁদলো। বৌ হু'জন আসেনি, তাদের একজন আসন্নপ্রসবা, অন্যজনের কোলে উনিশ দিনের শিশু। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে ছোটো বৌ-ই তাদের শান্ত করলো, নিরিমিষ রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিল। সেই রাতে শোকার্ত ননদ ভ্রাতৃবধূকে সন্তানের মতো করে নিজের বুকের তলায় নিয়ে শুলেন, চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'তিন বছরের সর্বকে মায়ের মৃত্যুর পরে আমিই কোলে ক'রে মানুষ করেছিলাম, আমার তখন দশ বছর বয়েস ছিলো। সেই সর্ব আজ কোথায় চলে গেল। তুই কাঁদিস না ছোটো বৌ, তোর কিছু ভয় নেই, তোর ভার, তোর ছেলেমেয়ের ভার সব আমি নেবো। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলেই এই নরক থেকে তোদের নিয়ে চলে যাবো। আর কোনোদিন আসবো না। এমন বাপের মুখ দেখবো না।'

সেই রাত্রে রোহিতেশ্বর মহেশ্বরও ঐ একই কথা বলাবলি করলো। সর্বেশ্বর তাদের ছোটোভাই। মাতৃহীন শৈশবে পিতার স্নেহে নয়, দিদি আর দাদাদের স্নেহেই সে লালিত পালিত। ধীর স্থির শান্ত একটি শিশু। সেই শিশু সর্বেশ্বরকেই বারে বারে মনে পড়তে লাগলো তাদের, বাবার উপর অদ্ভুত একটা ক্রোধে জ্বলতে লাগলো শরীর। রোহিতেশ্বর বললো, 'বাবাই এই প্রাণ-নাশের কারণ।'

মহেশ্বর বললো, 'নিশ্চয়ই। শেষে বেচারা কী কষ্টেই দিন

চালিয়েছে, তার উপর বাড়ি ভাড়ার তাগাদা। বুড়ো কি সোজা পাপী, গোটা বাড়িটার ভাড়া ঐ এক সর্বেশ্বরের কাছ থেকে আদায় করতো।'

'বৌমার এখন কী হবে?'

'আমরা আছি না। এখনো যদি বুড়ো ঝগড়া চালাতে চায়, দেবো সাতকথা শুনিয়ে। মায়া মমতা যা আছে, তা তো দেখছোই। কখনো শুনেছ এরকম, যে বাপের বয়স একাত্তর, যে বুড়ো নিত্য মরে, তার চোখের সামনে তারই দোষে তার বত্রিশ বছরের ছেলে দাপিয়ে মরে গেল আর তার চোখে এক ফোঁটা জল এলো না! খাচ্ছে দাচ্ছে কাজ করছে—একে কি মানুষ বলে?'

'ধ্যুৎ! মানুষ না হাতী!' রোহিতেশ্বর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বসলো বিছানায়। 'তুই দেখিস মহেশ, কাল সকালে উঠে বুড়োকে আমি কেমন দু'কথা শুনিয়ে দি। কে চায় ওর বিষয় আশয়। বিষয় আশয়ে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সকালের আলোয় কিন্তু সংকল্পের জোর আর অতটা তীব্র রইলো না। তবু রোহিতেশ্বর কিছু বলবে বলে দারুকেশ্বরের দরজার চৌকাঠে একবার দাঁড়ালো গিয়ে, আর কিছু না হোক, বুড়ো যেন সর্বেশ্বরের বৌকে দু'মুঠো আতপের বন্দোবস্ত ক'রে দেন। কিন্তু এই সময়ে কারো ঘরে ঢোকা দারুকেশ্বর একেবারেই পছন্দ করেন না, 'কী চাই' বলে একবার চোখ কুঁচকে ঘাড় ফেরালেন তিনি, তারপর বললেন, 'এখন যাও।'

ব্যাস। তক্ষুনি ফিরে এলো রোহিতেশ্বর। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো তামাকের গুল দিয়ে দাঁত মাজতে লাগলো উঠোনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুয়ে গুড়মুড়ি সহযোগে পাতলা এক কাপ চা খেয়ে কাজে বসলো গিয়ে। কাজ, কাজ আর কাজ। অতো-

বড়ো ব্যবসা, না করলেও চলে না অবিশ্যি, জনবল নেই তাদের। মাত্র দুই ভাইয়ে মিলে চালিয়ে নিচ্ছে সব। সর্বেশ্বর যতোদিন একসঙ্গে ছিলো, এমন হাঁপ ধরেনি, অনেক ফাঁকি দিতে পেরেছে। লেখাপড়ার যতো কাজ, সব সে করতো, ভালো ভালো পার্টির সঙ্গে সে-ই দেখা করতো, তার ওপরে ভা'য়েদের অনেক কাজও নির্বিবাদে ক'রে দিতো! এখন তার বদলে মাইনে করা আর একজন উকিল রেখেছেন বটে দারুকেশ্বর, কিন্তু সে কি আর সর্বেশ্বরের মতো করবে? তার নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট কাজ। তার বাইরে একটি মিনিটও এখানে সে অপব্যয় করে না।

দারুকেশ্বর শোকেতাপে বিশ্বাস করেন না, তা ছাড়া ও রকম একটা পিতৃদ্রোহী হতভাগা কুলাংগারের মৃত্যুতে তিনি বিচলিতই বা হবেন কেন? অন্য দুই ছেলেও যদি তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদেরও তিনি ক্ষমা করতে নারাজ।

কী দরকার বুড়োকে চটিয়ে। যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, তবে কেন নিজেদের বিপন্ন করা, বোকাটা তো গোঁয়ার্তুমি ক'রেই মরলো এ ভাবে। সত্যি বলতে বুড়ো আর ক'দিন! এখন ভালোয় ভালোয় মন জুগিয়ে খুশি রেখে বিষয়টুকু হাত করতে পারলেই শেষ রক্ষে হয়।

শ্রাদ্ধ হলো এগারো দিনে। নমো বিষ্ণু ক'রে ছোটো বৌই ঠাকুর পুরুত ডেকে যা পারলো করালো, নেড়া ক'রে দিল ছেলে-মেয়েকে। দারুকেশ্বর কিছুই দেখলেন না, কিছুই বললেন না, কেবল একদিন দরিদ্রভোজন করালেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, আর রোহিতেশ্বর মহেশ্বর যখন ছোটো বৌয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলো, বাধা দিলেন না কোনো।

শ্রাদ্ধের শেষে রোহিতেশ্বর বললো, 'তা হ'লে বৌমা এখন

কী করবে। যদি দিদির কাছে গিয়ে থাকে, আমি খোকাকে নবদ্বীপে তার কাকীমার কাছে নিয়ে যাই, ঘরের ছেলে পরের ঘরে মানুষ হওয়াটা ভালো নয়। তারপর ওর জ্যাঠাইমা যখন ফিরে আসবে, ও-ও সেই সময়েই আসবে। আমরাই ওকে মানুষ করবো।'

মহেশ্বর বললো, 'ইচ্ছে করলে বৌমা এখানেও থাকতে পারেন, আমরা না হয় বাবাকে ব'লে ক'য়ে—'

দিদি বললেন, 'সেটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিয়ে গেলেও এখুনি তো নিতে পারছি না। হাজার হোক সেটা আমার স্বামীর বাড়ি, আমার আর কতোটুকু জোর সেখানে। তাঁকে বলবো, তিনি রাজী হবেন, তবে তো। আর ছোটো-বৌও পরের বৌ, তারও তো এ পক্ষের একটা অনুমতি দরকার। বাবাকে না জানিয়ে—'

ছোটো বৌর চোখের কোলে কালি পড়েছে, গলার কণ্ঠা উঁচু হয়েছে, মাথার লম্বা চুলে জট বেঁধেছে। সব শুনে নিঃশব্দে একটু হাসলো।

তখন তিন-ভাইবোনে মিলে পরামর্শ দিল, 'তুমি বরং এক কাজ করো বাবার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও গিয়ে, হাজার হোক, ঘরের বৌ, এক কথায় কি ঠেলে দিতে পারবেন?' এই বলে সব কিছুর সমাধান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারা উঠলো। সকলেরই এখন যার যার কর্মস্থলে ফিরে যাবার তাড়া। ভাইয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যে যেভাবে ছিলো ছুটে এসেছে, আর একটা দিন থেকে ক্ষতি করতে চায় না। দুঃখ-বেদনা কিছু চিরস্থায়ী নয়, প্রথম যে ধাক্কাটা দেয় তার রেশ কি আর বেশীদিন থাকে? তাই এগারো দিনের ব্যবধানেই যথেষ্ট প্রলেপ লেগেছে তাদের

মনে। দারুকেশ্বরের কথা অবিশ্যি ধরা হচ্ছে না এখানে। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। প্যাকিং কেসের তদারক করছেন, হিসেব লিখছেন, টাকা গুনছেন, খিটিমিটি করছেন খরচপাতি নিয়ে। সামান্য পুত্রশোকে কাতর হবেন, এমন মূঢ়মতি নিয়ে ধরাধামে তিনি আসেন নি। তফাতের মধ্যে শুধু খাওয়াটা কমে গেছে।

ছোটো বৌর মনটা একটা কুয়াসাচ্ছন্ন দিনের লেপামোছা বোবা আকাশের মতো ধূসর হ'য়ে আছে। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, বিদ্যুৎ নেই, চন্দ্র নেই, কিছু নেই সেখানে! রোদ, আলো, আশা, আনন্দ এসব শব্দের যে কী অর্থ, কবে যে সেই অর্থের কোনো মানে ছিলো জীবনে তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে। একটা ছবিও যদি থাকতো সর্বেশ্বরের! মাঝে মাঝে মানুষটাকে যে কী ভয়ঙ্কর দেখতে ইচ্ছে করে!

শেষে টাইপিস্ট ছেলেটিকেই ডেকে পাঠালো সে। ছেলেটির নাম অনিল। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো এসে।

'আমাকে ডেকেছেন?'

'আমাকে কয়েকটা জিনিস বিক্রি ক'রে দেবে?'

'বলুন।'

'এই আয়নাটা, চেয়ারটা আর বুককেসটা। তোমার দাদার আইনের বইও আছে কিছু কিছু।'

'এগুলো বিক্রি করা কি খুব দরকার?'

'খুব দরকার।'

'আমি বলছিলাম কী—'

'আর একটা ঘরও খুঁজে দেবে?'

'ঘর !'

'বস্তির ঘর-টর। আট দশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না ?'

অনিল ঢোক গিললো।

'আর একটা চাকরি।'

'চাকরি !'

'লেখাপড়া সামান্যই শিখেছি, তাও ইস্কুল কলেজে নয়। বাড়িতে দাদার কাছে। ছোটো ছেলেদের পড়াতে পারবো কয়েক ক্লাশ পর্যন্ত। তবে তা যদি এক্ষুনি না জোটে, ব'সে তো থাকতে পারবো না। কোনো বড়োলোকের বাড়িতে সেবা-টেবার কাজ, যাতে একটু মাইনে বেশী পাওয়া যায়, ঘরভাড়াটা দিয়ে বাচ্চা দু'টোকে খাওয়ানো চলে, না হয় আপাতত সেই রকমই একটা কিছু -আমার রান্নার কাজেও আপত্তি নেই।'

অনিলের চোখ মাটিতে নিবদ্ধ।

'পারো না ?'

'কিন্তু এখানে—'

'না, এখানে হয় না।'

'আপনার দাদা— '

'তাঁকে আমি আমার অবস্থার কথা জানাইনি, জানাবোও না।'

অনিল চুপ ক'রে থেকে যেন ঝুপ ক'রে ডুব দিলো, 'দেশে আমার মা আছেন, দিদি আছেন, আমি আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাবো।'

এ কথায় ছোটো বৌকেও চুপ করতে হ'লো একটু। ধরা গলায় বললো, 'তুমি আমার ছোটো, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিতে পারি ? অভাব কী জিনিস তা তো তুমি জানো অনিল।

মা আর দিদি আছেন থাকুন, এখানে আমরাও কাজ করি, অনর্থক বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ।'

'আমার কোনো বোঝা বাড়বে না।'

'কিন্তু তাতে যে তোমার চাকরি যাবে?'

'যাক। আমি চাইনা এখানে থাকতে, আমি পারবো না এখানে।' বাইশ বছরের অনিলের চোখ জলে ভ'রে গেল।

৪

সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করতে আট-দশ দিন সময় লাগলো। জিনিসগুলো চেষ্টা-চরিত্র ক'রে মোটামুটি ভদ্র দামেই বিক্রী ক'রে দিতে পারলো অনিল, তার নিজের একজন সহৃদয় আত্মীয়ের বাড়ির একটি ঘরও যোগাড় ক'রে ফেললো ভদ্র ভাড়ায়, একটা চাকরির সন্ধানও পাওয়া গেল। একজন অসুস্থ ভদ্রমহিলার কয়েকটি শিশুর লালন-পালন করা। একেবারে ঝিয়ের কাজের মতো নিচু নয়, তাদের লেখাতে-পড়াতেও হবে, সংসারটাকেও দেখাশুনো করতে হবে। সকাল ছ'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত। অল্প মাইনের গভর্ণেস আর কি। অনিলের একটুও ইচ্ছে ছিলো না, ছোটো বৌ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলো। সমস্যা হ'লো নিজের শিশুদের নিয়ে। তাদের রাখবে কোথায়? খেতে দিতে না হ'লে তারাও যদি মায়ের সঙ্গে যায়, তাতেও আপত্তি নেই গৃহিণীর।

অতএব সব জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে নিল ছোটো বৌ। কী বা জিনিস। একটি ট্রাঙ্ক আর খান কয়েক শাড়ি! ভেবেছিলো সকালেই চ'লে যাবে, সর্বেশ্বরের শত স্মৃতি-বিজড়িত ঘরখানার

দিকে তাকিয়ে যাবার মুহূর্তে তার পা সরলো না, সকালকে সে দুপুরে নিয়ে এলো। দুপুরকে রাত্তিরে। শেষে অনিল বললো, 'তাহ'লে কালকেই চলুন। আজ আর রাত্রি ক'রে গিয়ে কী হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোটো বৌ বললো, 'তাই ভালো।'

দারুকেশ্বর কিছুই জানতেন না। খবরটা যথারীতি নিবারণই দিল। রাত্রিবেলা পা টিপতে টিপতে বললো, 'ছোটো বৌদি তো ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন কর্তাবাবু, আবার কারোকে ভাড়া দেন তো ঐ বাড়ির শালাবাবু নেবেন, বলছেন।'

দারুকেশ্বর অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'কী!'

'তেতালার নগেন বাবুর শালার কথা বলছি, টাকা আছে, ভাড়া ঠিকমতো দেবে।'

'উঁ।'

'তেমন মোচড় দিলে দু'-চার টাকা বেশীও পেতে পারেন। গরজ খুব।'

'কিসের গরজ?'

'ঘরটা নেবার।'

'কোন্ ঘর?'

'ছোটোবাবুর ঘরটা।'

'কী বললি?'

'বলছিলাম, পূবের ঘরটা তো ফাঁকা হ'য়ে যাচ্ছে—'

'কেন?'

'ছেলেমেয়ে নিয়ে ছোটো বৌদি চ'লে যাচ্ছেন যে--'

'চ'লে যাচ্ছেন!'

'আজ্ঞে, কর্তা।'

'কোথায়?'

'কোথায় সস্তা ভাড়ায় ঘর ঠিক করেছেন।'

'কেন! কে তাদের যেতে বলেছে?'

'কে আবার বলবে। ছোটো দাদাবাবু বেঁচে থাকতেই ভাড়া টানতে পারতেন না, আর এখন তো'—

দারুকেশ্বর ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে ব'সে ঠাস ক'রে এক চড় কসিয়ে দিলেন নিবারণের গালে, 'ভাড়া, ভাড়া, ভাড়া। ভাড়ার কথা কে বলেছে তাদের, কার এতো সাহস? কে ভাড়া দেবে, কে ভাড়া নেবে?'

চড় খেয়ে হতভম্ব হ'য়ে ছিটকে স'রে দাঁড়ালো নিবারণ।

দারুকেশ্বর কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে রক্ত চক্ষে তাকালেন, দাঁতে দাঁত ঘষলেন, তারপর কোমরের খোলা ধুতি ধরতে ধরতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এলেন এই ঘরে, সর্বেশ্বরের ঘরে।

'বৌমা!'

ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে, মেঝেতে হাঁটু ভেঙে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো ছোটো বৌ, শ্বশুরকে দেখে অবাক হ'য়ে মাথায় আঁচল তুলে উঠে দাঁড়ালো।

দারুকেশ্বর মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইলেন তার বৈধব্যের দিকে, তাকালেন ঘরের চারদিকে, তারপর পাগলের মতো সারা ঘরময় কী যে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কে জানে। কী আছে ঘরে! কোনো চিহ্নই নেই। সব পরিষ্কার। কেবল কোণের দিকে এ বাড়ির একটা বড়ো আলনা, আর আলনার হুকে সর্বেশ্বরের একটা শতছিন্ন পুরোনো গেঞ্জি।

দারুকেশ্বর লোভীর মতো লাফিয়ে এসে তুলে নিলেন সেই ময়লা গেঞ্জিটা, দু' হাতে মেলে ধ'রে দেখতে লাগলেন বড়ো বড়ো চোখে, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসে শুঁকতে লাগলেন, জড়ো

ক'রে তুলে চেপে ধরলেন বুকে, চেপে ধরলেন মুখে, তারপর হঠাৎ একটা বুকফাটা আর্তনাদে সমস্ত ঘর, সমস্ত বাড়ি, সমস্ত পাড়া আলোড়িত ক'রে ডেকে উঠলেন, 'সর্বেশ্বর! বাবা সর্ব!'

পড়ে যাচ্ছিলেন, ছোটো বৌ এসে জড়িয়ে ধরলো, সর্বেশ্বরের শূন্য তক্তপোষটার উপরে শুইয়ে দিলে কোনোমতে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো লাগলো। তারপর ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে নিবারণকে পাঠিয়ে দিলে ডাক্তার ডাকতে।

বুকটা এতোখানি ওঠা-পড়া করছে দারুকেশ্বরের, গলা দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঘড়্ ঘড়্ ক'রে, ছোটো বৌর হাতটা তিনি জোরে চেপে ধরলেন, 'মা গো, কোথায় যাবে তুমি, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় যাবে?' গর্তে বসা চোখের কোল বেয়ে তাঁর এতোদিনের সব জমানো জল অঝোর ধারে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ছোট বৌ বললে, 'কোথাও না, কোথাও যাবো না। আপনি শান্ত হোন।'

ডাক্তার এলেন, মুখের ভাব গম্ভীর ক'রে বললেন, 'যে যেখানে আছে খবর দিয়ে দিন।'

কিন্তু ছেলেরা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না দারুকেশ্বর। সর্বেশ্বরের খাটে শুয়ে, ছোটো বৌর কোলে মাথা রেখে, সর্বেশ্বরের মতো ক'রেই মারা গেলেন তিনি। যে তিন দিন রইলেন সেবা যত্নের এতোটুকু ত্রুটি করলো না ছোটো বৌ, আসবাব বেচা দু'শো টাকা ডাক্তারে ওষুধেই খরচ হ'য়ে গেল। শেষ সময় অস্পষ্ট আওয়াজে দারুকেশ্বর বললেন, 'ক্ষমা করো!' মুখ ফিরিয়ে ছোটো বৌ চোখের জল লুকোলেন্। দারুকেশ্বরের কম্পিত হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উঠতে গিয়েও শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়লো। তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

ছেলেরা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে দেখতে পেলো না বাপকে। প্রতিবেশীদের কাছে খুব কান্নাকাটি করলো, ঘরে এসে উকিল ডাকিয়ে উইল দেখতে বসলো।

উকিল বললেন, 'স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এতোদিন একমাত্র ছোটো ছেলের নামেই ছিলো, ছেলের মৃত্যুর পরে সেই উইল বদলে তিনি সেটা তাঁর ছোটো পুত্রবধূ শ্রীমতী মাধবী-লতার নামে ক'রে দিয়ে গেছেন। আর সেই সঙ্গে একটি অন্তিম বাসনা জানিয়েছেন। তাঁর মৃত ছেলের নামে যেন তাঁর নিজের গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। সেই ভারও তিনি তাঁর ছোট পুত্রবধূ শ্রীমতী মাধবীলতার উপরই অর্পণ ক'রে গেছেন।'

বড়ো ছেলে বললো, 'শালা বুড়োর শ্রাদ্ধ করে কে দেখবো।'

মেজো ছেলে বললো, 'বেঁচে থাকলে গুলি ক'রে মেরে কেটেকুটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতাম।'

বৌরা বললো, 'ওর অনন্ত নরক হবে, ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ভাজা ভাজা হবে চিরদিন।'

সব শুনে ছোটো বৌ ভাসুরদের কাছে লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে রইলো।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে নিবারণ বললো, 'ছোট বৌদি ভাড়া না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই টাকার শোকেই পাগল হ'য়ে মরে গেলেন কর্তাবাবু।'